কাটল্ ফিশ

নেহরু বাল পুস্তকালয়

জলের নীচে আজব জীবন

ব. ফ. ছাপগর

অনুবাদ
ঈশানী রায়চৌধুরী

ছবি
প্রণব চক্রবর্ত্তী

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া

ISBN 81-237-2192-7

প্রথম সংস্করণ : 1997 (শক 1919)

Wonder World Under Water (*Bangla*)

মূল্য : 10.00 টাকা

নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, এ-5, গ্রীন পার্ক, নিউদিল্লি 110016 কর্তৃক প্রকাশিত

আমাদের এই পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগই জল। তবুও, সাধারণভাবে, যেহেতু আমরা স্থলে বাস করি, স্থলচর জীব সম্বন্ধেই আমরা অনেক বেশি ওয়াকিবহাল। আমাদের চারপাশে জল নেহাত কম নেই—হিমালয়ের তুষারগলা নদী, ঝর্ণা ; সমতল ভূমির নদ-নদী, প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম হ্রদ, জলাশয় ইত্যাদি তো আছেই। তাছাড়া আছে প্রায় 5600 কিলোমিটার লম্বা সমুদ্রতটভূমি। এ-সবের অগুনতি বিচিত্র জলচর জীবেরাও কিন্তু সব সময়েই আমাদের প্রতিবেশী।

সমস্ত জলচর প্রাণীরই শারীরিক গঠন জলে বসবাস করার জন্যই বিশেষভাবে গঠিত। কোনো কোনো প্রাণীর ক্ষেত্রে অবশ্য এই বৈশিষ্ট্য তেমন নজরে পড়বার মতো নয়। উদাহরণ হিসেবে হ্যালোবেটস (Halobates) জাতীয় কীটের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সমুদ্রতট থেকে বেশ কয়েকশ' কিলোমিটার দূরে মাঝ-সমুদ্রে জলের ওপর এরা দিব্যি হেঁটে বেড়ায়। স্থলচর জীবের মতোই এরা বাতাসে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়। এরা দেখতেও ঠিক স্থলচর জীবের মতোই। এর বিপরীত উদাহরণও আছে। যেমন তারা মাছ বা স্টার ফিশ (Star Fish) এবং স্পঞ্জ (Sponge) সম্পূর্ণ ভাবেই জলের জীব।

জলচরদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল তাদের দেহে বিশেষ ধরনের শ্বাসযন্ত্রের গঠন। স্থলচররা ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসক্রিয়া চালায় ; কিন্তু জলচরদের শ্বাসযন্ত্র হল কানকো বা ফুলকা (Gills), অবশ্য কিছু কিছু মাছের শ্বাসযন্ত্রের আকৃতি এমনই যে তা ফুসফুসের মতো কাজও করে, অর্থাৎ জলের ওপরের বায়ুস্তর থেকে বাতাস শোষণ করে নিয়ে তারা শ্বাসক্রিয়া চালায়।

সামুদ্রিক মাছের দেহের ভেতরে তরল পদার্থের মধ্যে নুনের ভাগ কিন্তু সমুদ্রের জলের নুনের ভাগের তুলনায় কম, কারণ, মাছ সবসময়ই তার দেহ ও কানকো দিয়ে জল বের করে দেয়। আর জলের ধর্মই হলো যে দ্রবণে স্বল্পমাত্রার দ্রাব আছে তা থেকে যে দ্রবণে বেশিমাত্রার দ্রাব আছে সেদিকে বয়ে যাওয়া। এই যে মাছের শরীর ও ফুলকো দিয়ে ক্রমাগত জল নির্গত হয় তা পূরণ করতে মাছ অনবরতই জল পান করে। অন্যদিকে মিঠে জলের মাছেদের ক্ষেত্রে এটা ঘটে বিপরীত ভাবে। এদের শরীরের জলভাগে দ্রাবের পরিমাণ বাইরের জলের দ্রাবের থেকে বেশি। সুতরাং এই মাছেরা ক্রমাগত জল শোষণ করে। আর অতিরিক্ত পরিমাণ জল দেহ থেকে বৃক্কের (Kidney) সাহায্যে বের করে দেয়।

মজার ব্যাপার হল জলচর প্রাণী বা জলজ উদ্ভিদ কিন্তু জলের তুলনায় ভারী। তাই প্লবতা হল এদের স্বাভাবিক ধর্ম। প্লবতার (Buoyancy) মানে, জলে ভেসে থাকবার ক্ষমতা। এদের দেহে সঞ্চিত বিন্দু আকৃতির স্নেহজাতীয় পদার্থ শিরদাঁড়ার বৈশিষ্ট্য বা দেহে লোমের আধিক্য অথবা দেহের দু-পাশে চ্যাপটা ছড়ানো ডানার মতো উপাঙ্গ এই প্লবতা বাড়ায়। অবশ্য

যে-সব জলচররা সাঁতারু, তারা প্রয়োজন মতো সাঁতার কেটে কেটে জলের ভেতর ডুব দিতে পারে বা ভেসে উঠতে পারে। জলে বাস করার প্রধান সুবিধা হল, জলের যে ঘনত্ব (Density) তা জলচরদের নিজের দেহের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। অভিকর্ষ (Gravity) যা স্থলচর বা নভোচর প্রাণীদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে দেখা যায়—তা এক্ষেত্রে ঘটে না।

সুতরাং, প্রকৃতির নিয়মে, স্বাভাবিক ভাবেই, এদের হাড়ের ওজন অনেক কম, ফলে আকার বিরাট হলেও তা অসুবিধার কারণ ঘটায় না। এর সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল তিমি মাছ (Whale)।

জলচরদের ক্ষেত্রে (তা সাগরেরই হোক বা নদী-নালার) সবচেয়ে ভীতির কারণ হল যদি জল শুকিয়ে যায়। অনেক জলচর প্রাণী অবশ্য এই ধরনের বিপর্যয় ঘটলে নিজেদের জলের একেবারে নীচে কাদার মধ্যে ডুবিয়ে রাখে। তবে সেক্ষেত্রে শ্বাস-প্রশ্বাস ও দেহের নানা প্রক্রিয়ার গতি হয়ে যায় খুবই মন্থর।

অন্যদিকে যে সব উদ্ভিদ ও প্রাণী বহমান জলে থাকে তাদের সবার আগে নজর দিতে হয়, আত্মরক্ষায় বিষয়ে, অর্থাৎ যাতে স্রোতের টানে তারা ভেসে না যায়। তাই এদের দেহে বিশেষ ধরনের শোষক (Suckers) থাকে, যা দিয়ে এরা পাথরের খাঁজে বা শেওলার মধ্যে নিজেদের আটকে রাখতে পারে। এদের দেহের গঠনও তাই হয় পাতলা ও চ্যাপটা, যাতে জলের তোড়ে দেহে কোনোরকম ক্ষতি না হয়।

স্থলচরদের তুলনায় জলচরদের বংশবৃদ্ধি হয় অপেক্ষাকৃত সহজে। এক্ষেত্রে স্ত্রী ও পুরুষ জীব যথাক্রমে ডিম্বাণু ও শুক্রাণু জলে ছেড়ে দেয়। আর ওই ডিম্বাণু ও শুক্রাণু স্রোতের টানে মিলিত হয়ে বংশবৃদ্ধি ঘটায়।

অনেক জলচর প্রাণীর খাবার-দাবারের অভ্যাসও অভিনব। জলে ভেসে আসা খাদ্যকণা সরাসরি এদের খোলা রাখা মুখ-গহ্বরে ঢুকে যায়। আর মুখের ভেতর ঝাঁঝরির মতো ছিদ্রযুক্ত একটা অংশ আছে। এবার খাদ্যকণাবাহী জল ওই ঝাঁঝরিতে গিয়ে যখন পড়ে তখন খাদ্যকণাগুলো ঝাঁঝরিতে আটকে যায়। তখন অতি সহজেই ওই খাদ্যকণা তারা গিলে ফেলে খিদে মেটায়। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাণী ব্যালিন তিমিও (Baleen Whale) এই একই নিয়মে খাওয়া-দাওয়া সারে।

এই বইটিতে আলোচনার বিষয়বস্তুগুলো আলাদা আলাদা ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি ভাগে একাধিক জলচর সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। যাদের মধ্যে কোনো না কোনোভাবে কোনো সাদৃশ্য আছে। তাছাড়া বইটি এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে জলচর প্রাণীর ক্রমবিবর্তনের ছবিটিও তাতে ধরা পড়ে, অর্থাৎ প্রাচীনদের দিয়ে শুরু করে নবীন
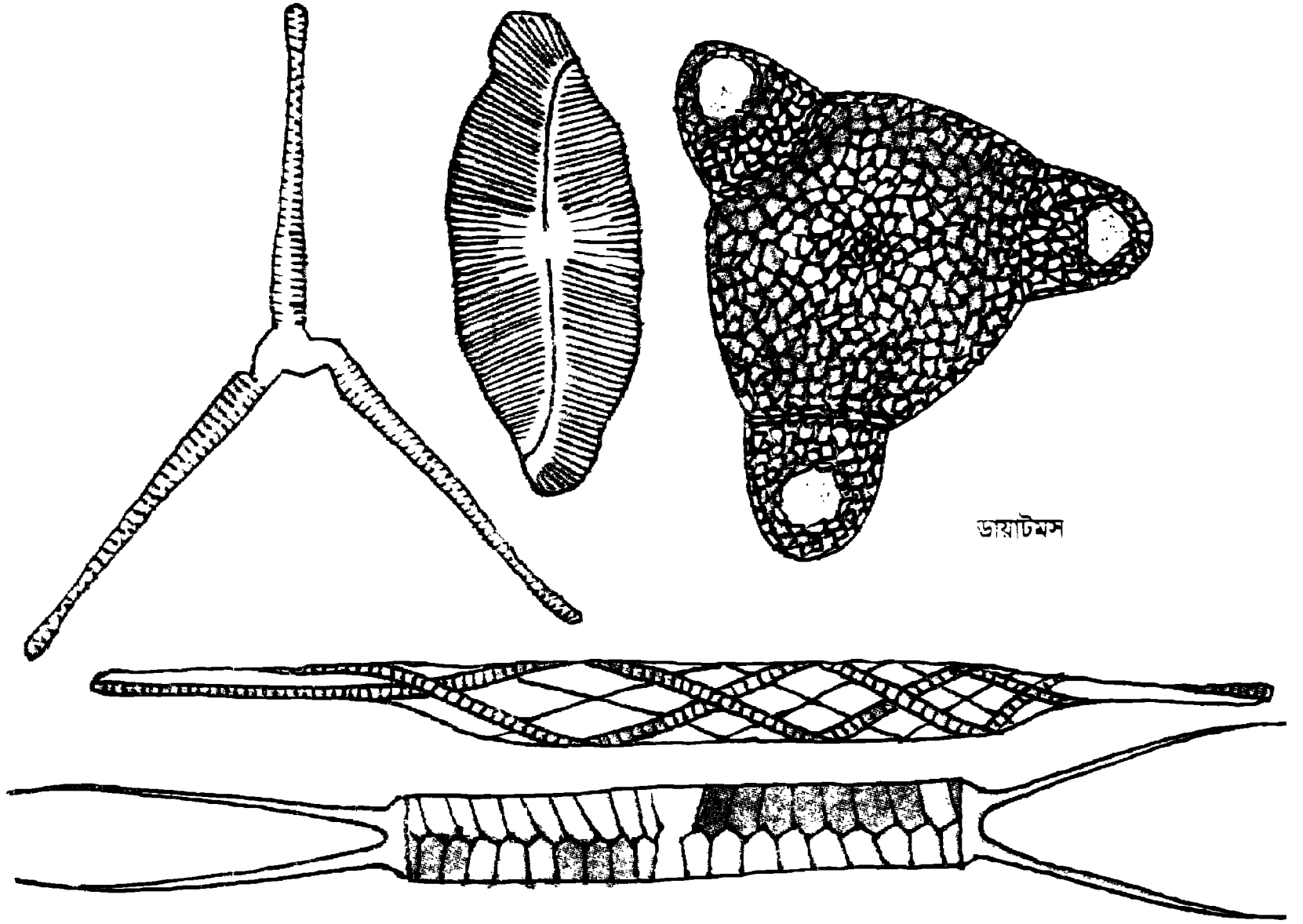
প্রাণীরা অবধি রয়েছে আলোচনায়। অর্থাৎ বইয়ের শুরু হচ্ছে প্রাচীনতম এককোষী প্রাণী দিয়ে আর শেষ হচ্ছে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের আলোচনায়।

উদ্ভিদ : স্থলজ গাছপালা, লতাপাতার মতোই জলজ উদ্ভিদও খাবার বানাবার জন্য আর পুষ্টির জন্য সূর্যের আলো চায়। যেহেতু বায়ুর মতো জল অতটা স্বচ্ছ নয়, তাই সূর্যের আলো জলের নীচে মাত্র একশ' মিটারের কাছাকাছি গভীরতা পর্যন্তই পৌঁছুতে পারে। সুতরাং পাথরে, কাদায় যে-সব উদ্ভিদ জন্মায়, তাদের অগভীর জলের ওপরই পুরোমাত্রায় নির্ভর করতে হয়। অবশ্য জলজ উদ্ভিদের এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে বিশেষ ধরনের দুই প্রকোষ্ঠে বিভক্ত এককোষী শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ, ডায়াটম্‌স (Diatoms) ; এরা ভাসমান অবস্থায় থাকে। এরা সাধারণত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জলচর প্রাণীর খাদ্য।

নদী বা পুকুরের ঠিক তীরেই অনেক গাছ দেখা যায়, যাদের অল্পক্ষণের জন্য জলের তলায় রাখলেও বেঁচে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা স্থলজীবি। আবার অনেক উদ্ভিদ

পুরোপুরিই জলের নীচের বাসিন্দা। সামুদ্রিক আগাছা এই শ্রেণীর। এদের ফুল হয় না। এদের রঙ্ হয় সবুজ, নীলচে সবুজ, বাদামী বা লাল।

সামুদ্রিক আগাছা কিন্তু অনেক কাজে লাগে। এদের ঠিক বাঁধাকপির মতোই রান্না করে খাওয়া যায়। এদের খাদ্যগুণও অনেক, কারণ, এদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আয়োডিন থাকে। বহুক্ষেত্রে এই আয়োডিন নিষ্কাশন করে নিতে হয়। অনেক আগাছাতে আবার অ্যালগিনিক অ্যাসিড (Aliginic Acid) থাকে, যা দাঁতের মাজন আর আইসক্রীমের মসৃণতা আর পেলবতা বাড়ায়।

জলচর প্রাণী : জলজ উদ্ভিদের সঙ্গে জলচর প্রাণীর প্রধান তফাত হল, প্রায় সব জলচর প্রাণীই ইচ্ছামতো বিচরণে সক্ষম। অবশ্য যারা কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় স্থিরভাবে পুরো জীবনটাই কাটিয়ে দেয়, তাদের কথা আলাদা। বিচরণক্ষম জলচর প্রাণীদের মোটামুটিভাবে তিনটি ভাগ। একদল দুর্বল সাঁতারু। তারা ছোটই হোক বা বড়। তাই স্রোতের টানে যতটুকু চলাফেরা করা সম্ভব তাই করে। এদের নাম প্ল্যাংকটন (Plankton)। দক্ষ সাঁতারুরা, অর্থাৎ সব রকম মাছ আর কাট্‌ল ফিশ (Cuttle fish) দ্বিতীয় দলে। এদের নাম নেকটন (Nekton)। তৃতীয় দলের প্রাণীরা থাকে জলের নীচে, কাদায় বা পাথরে। সেখানে এরা চুপচাপ বসে থাকে বা কখনো বা হামাগুড়ি দিয়ে সামান্য নড়াচড়া করেই জীবন কাটিয়ে দেয়। এদের নাম বেনথোস (Benthos) জাতীয়।

এককোষী প্রাণীদের কথা

আমাদের দেহের ভেতরে নানান রকম যন্ত্র আছে যেমন, পাকস্থলী, যকৃত, হৃদপিন্ড, মস্তিষ্ক, বৃক্ক, ফুসফুস ইত্যাদি। এই সব যন্ত্রগুলো অনেকগুলো তন্তুর সমবায়ে গঠিত যেমন, স্নেহজ পদার্থ, কোমলাস্থি, পেশী ইত্যাদি। আবার এদের প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোষের সমষ্টি। আমাদের দেহে এই রকম হাজার হাজার কোষ আছে। কোষেরা প্রত্যেকেই নিজেদের নির্দিষ্ট কাজ করে। তাই আমরা, প্রকৃতপক্ষে, বহুকোষী প্রাণী। কিন্তু সৃষ্টির আদিমতম যুগে যে-সব প্রাণীর প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল তারা কিন্তু সকলেই ছিল এককোষী। অর্থাৎ তাদের কোষ ছিল মাত্র একটি।

এই ধরনের সর্ব-প্রাচীন এককোষী জীব হল **অ্যামিবা**। এদের দেহের গঠন একই রকম নয়। চলাফেরার সময় এরা দেহেরই এক অংশ এগিয়ে এগিয়ে চলে। এই এগিয়ে নেওয়া অংশটির নাম, স্যুডোপোডিয়াম (Pseudopodium) বা কৃত্রিম পা। অনেকটা যেমন জলের একটি ফোঁটা মসৃণ তলের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেলে যেমনটা দেখায় ঠিক তেমনই অ্যামিবার

চলন। চলার পথে কোনো খাদ্যকণা পেলে এই কৃত্রিম পায়ের মতো অংশটি ওই খাবারকে সম্পূর্ণভাবে গিলে ফেলে। খাবারের যে অংশ দুষ্পাচ্য থাকে তা আবার ওই কৃত্রিম পা ফাঁক করেই অ্যামিবা বের করে দেয়। এর বংশবৃদ্ধির উপায়ও খুব সহজ। এরা ইচ্ছেমতো চট করে দু-ভাগে ভাগ হয়ে যায়। প্রতিটি ভাগই কিন্তু জীবন্ত ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ। অনেক সময় দেখা যায়, টুকিটাকি আবর্জনা নিজেদের চারদিকে জমিয়ে নিয়ে এরা দেহের চারপাশে একটা আবরণের সৃষ্টি করে। অন্য শ্রেণীর প্রাণী যেমন গ্লোবিগেরিনা (Globigerina) আর রেডিওলারিয়া (Radiolaria) সমুদ্রের জল থেকে চুণ, বালি সংগ্রহ করে এই আবরণ তৈরি করে। খালি চোখে এদের প্রায় দেখতেই পাওয়া যায় না। যখন এরা মারা যায় তখন সেই দেহাবশেষ সমুদ্রের একেবারে তলদেশে জমা হয়। আবরণের স্তূপ যে অংশ জুড়ে থাকে তাকে বলা হয় 'উজ্' (Ooze)। এই আবরণ বা খোলসগুলো বিচিত্র আকারের হয়। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে সে-সব দেখতেও ভারী সুন্দর।

এই ধরনের প্রজাতির কিছু কিছু (যেমন সান অ্যানিম্যালকিউল—Sun Animalcule:
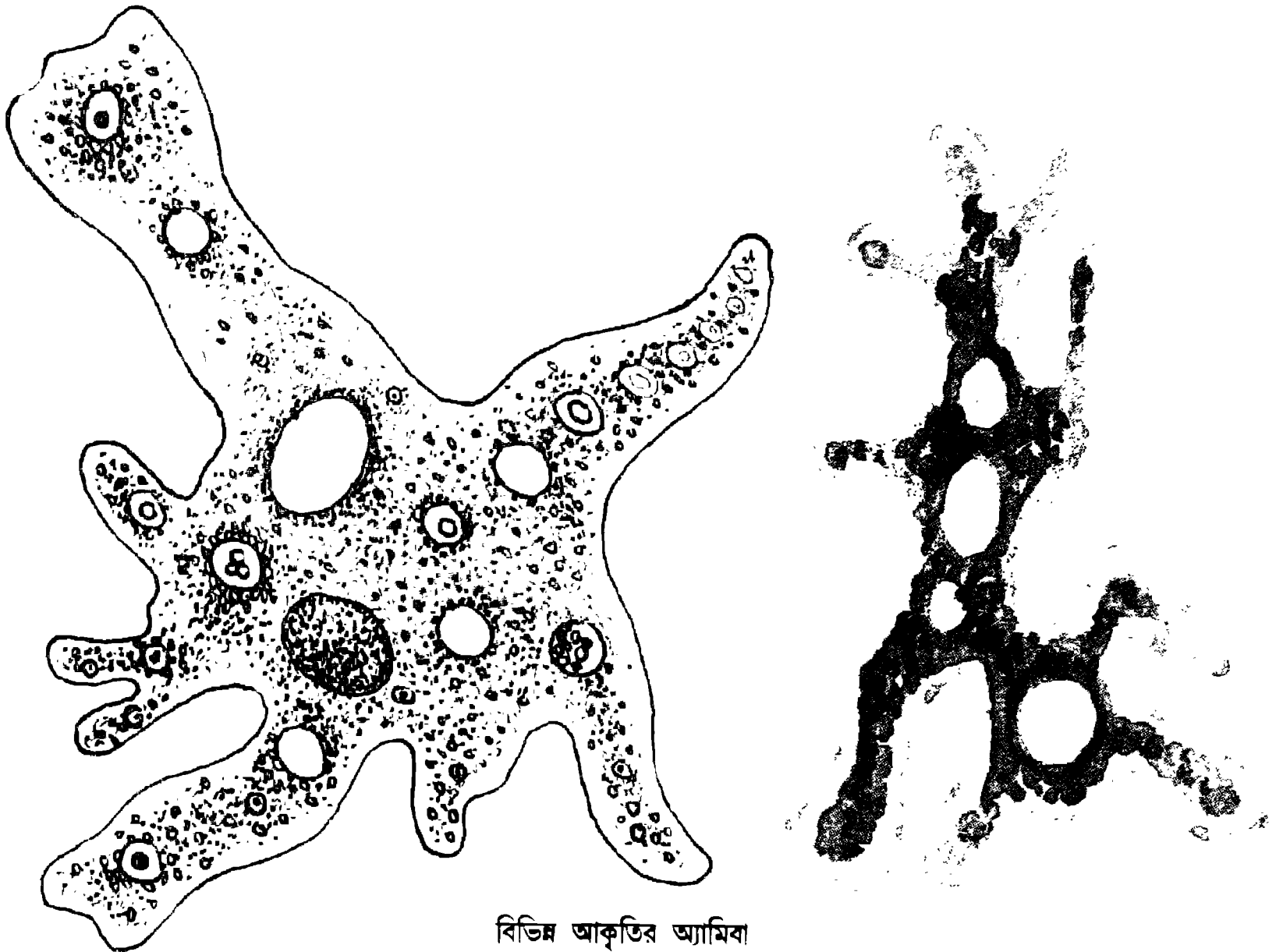
বিভিন্ন আকৃতির অ্যামিবা
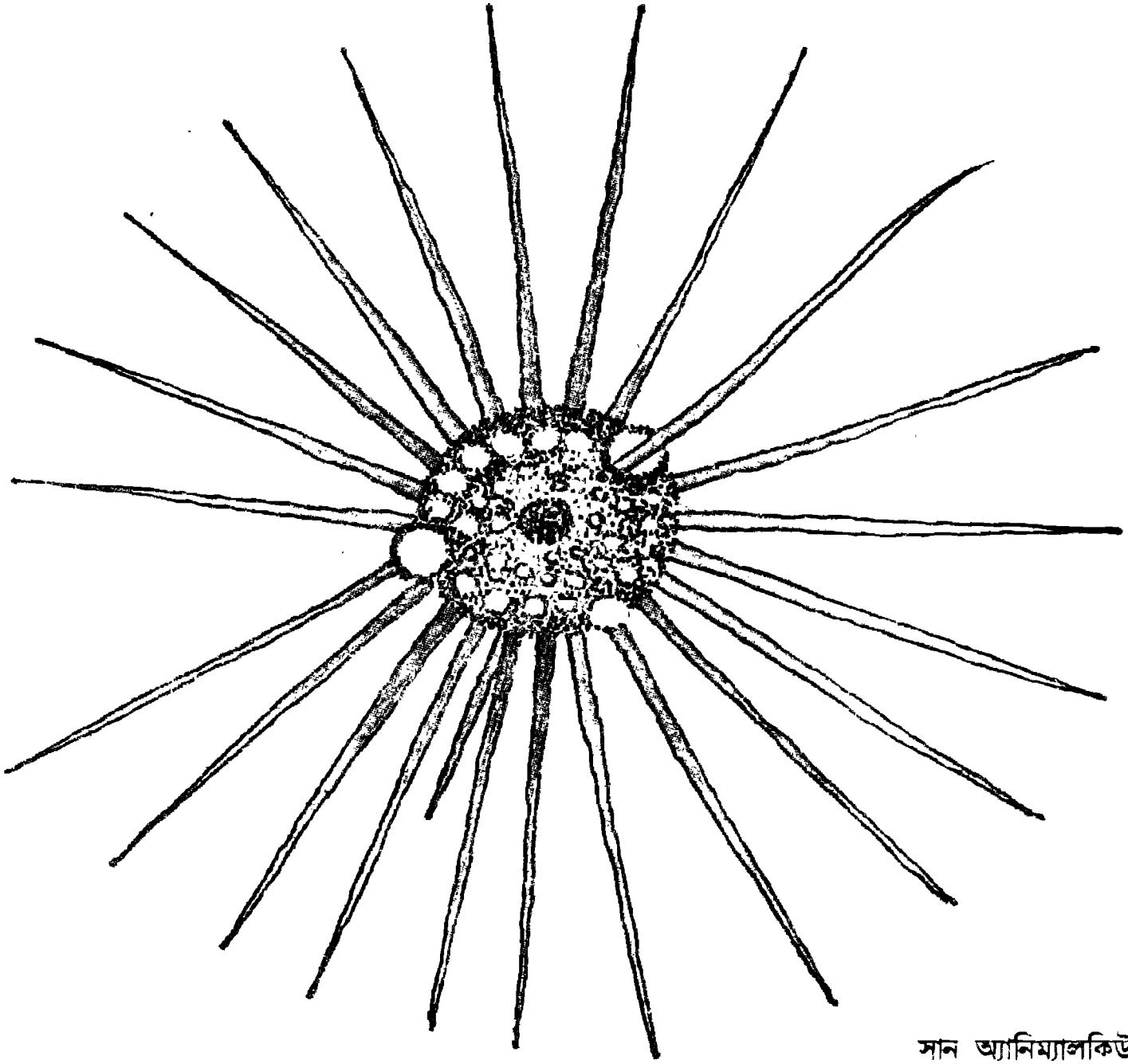
সান অ্যানিম্যালকিউল

অ্যাকটিনোফ্রিস সল (Actinophrys sol) কৃত্রিম পা (সংখ্যায় একাধিক) প্রাণীদেহটির চারপাশে ঠিক সূর্যরশ্মির মতোই ছড়িয়ে থাকে।

এদের চেয়ে সামান্য উন্নততর প্রজাতি হল, **ফ্ল্যাজেলেটস** (Flagellates)। এদের দেহ নরম আবরণের মধ্যে থাকে, যাতে প্রাণীটি খোলসের মধ্যে থেকেই প্রয়োজনে শরীর লম্বা করতে বা বেঁকাতে পারে। তবে অ্যামিবার মতো স্বাধীনভাবে এরা চলতে পারে না। এদের দেহের এক প্রান্তে লম্বা বেতের মতো একটা চুল থাকে—যার নাম ফ্ল্যাজেলাম (Flagellum)—অনেক সময় আবার এই চুলের সংখ্যা দুটিও হয়। এই চুলের সাহায্যে প্রাণীটি জলে চলাফেরা করতে পারে। এই ফ্ল্যাজেলেটস গোষ্ঠীর কিছু কিছু প্রাণী যেমন উইগ্লেনা বা ইউগ্লিনার

(Euglena) শরীরে ক্লোরোফিলের (Chlorophyll) সবুজ কণা দেখা যায়, এই ক্লোরোফিল উদ্ভিদদেহেও আছে। উদ্ভিদের মতোই এই ক্লোরোফিলের সাহায্যে ইউগ্লিনা সূর্যরশ্মি থেকে শক্তি আহরণ করে খাদ্য প্রস্তুত করে। উদ্ভিদবিদ্‌রা তাই দাবি করেন ইউগ্লিনাও এক রকমের উদ্ভিদ। কিন্তু আবার প্রাণীতাত্ত্বিকদের মতে যেহেতু ইউগ্লিনা জলে সাঁতার কাটতে পারে, সুতরাং এটি উদ্ভিদ নয়, প্রাণী। অনেক সময় একাধিক ফ্ল্যাজেলেটস দলবদ্ধ ভাবেও বসবাস করে। এরা স্বাধীনভাবে থাকতে সক্ষম হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এদের মধ্যে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপনের প্রবণতা দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে আর একটি উদাহরণ হল **ভলভক্স** (Volvox)।

অনেক সময় ফ্ল্যাজেলেটসরা ক্ষতিকারকও হয়। এদের একটি প্রজাতি বিপুলভাবে বংশবৃদ্ধি করে সাগরের জলকে লাল করে দেয় ; আর এদের দেহনির্গত রস এতই বিষাক্ত যে সামুদ্রিক মাছও তার সংস্পর্শে এলে মারা যায়। তাই অনেক সময়ই দেখা যায়, বহুদূর পর্যন্ত সমুদ্রের জলে মৃত মাছ ভেসে উঠেছে। আবার এদের আর একটি উপশাখার দেহ থেকে আলো নিঃসৃত হয় ; এই শ্রেণীর শত-সহস্র প্রাণী যখন এক জায়গায় থাকে, মনে হয় যেন জলে আগুন জ্বলে উঠেছে।

অন্যান্য এককোষী প্রাণী অবশ্য পরজীবী (যেমন ম্যালেরিয়া রোগের ধারক। মশা এ

ভলভক্স

ইউগ্লিনা
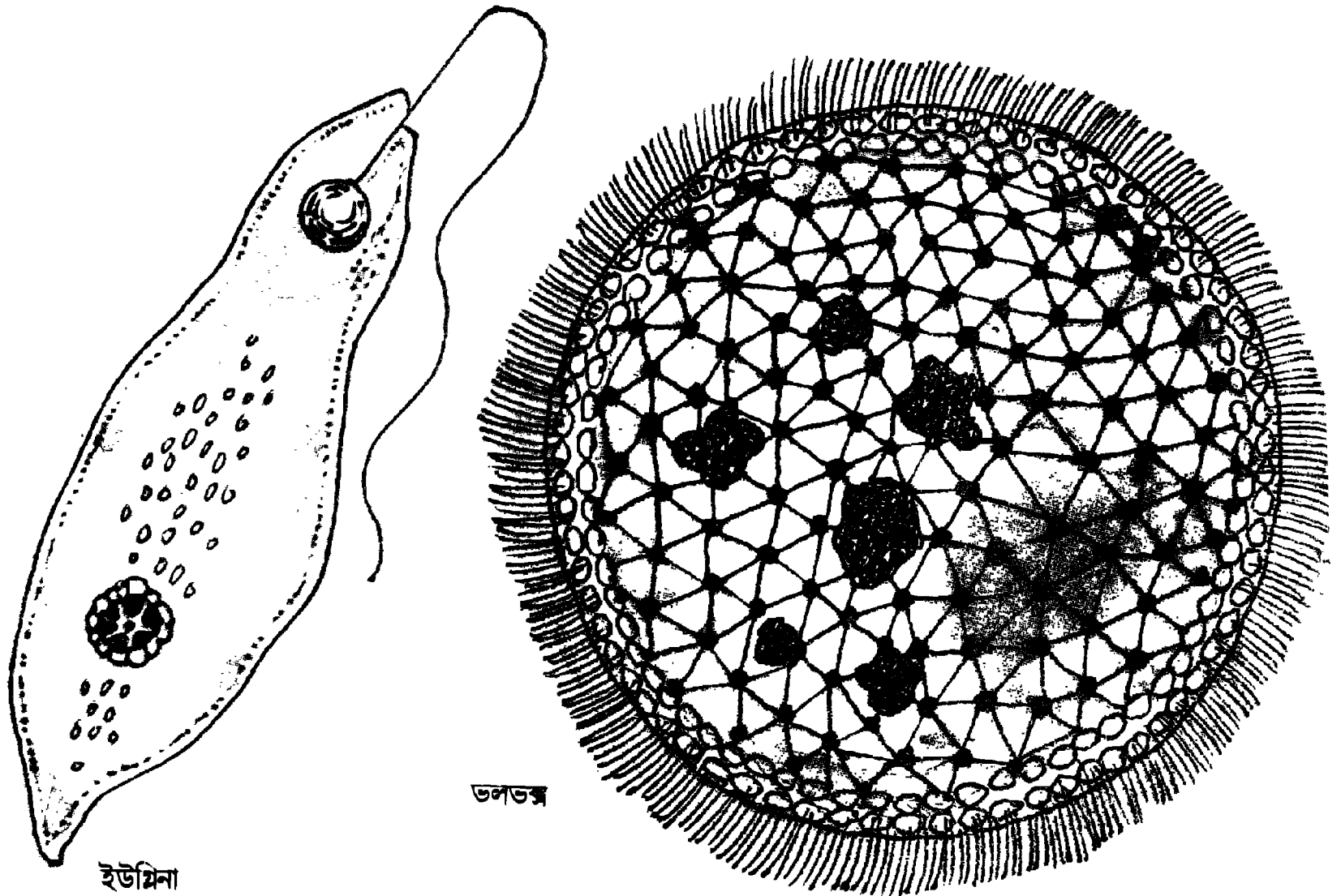
রোগের বাহক কিন্তু, মশার কখনই ম্যালেরিয়া হয় না) এই সব পরজীবীরা থাকে মাছ ও অন্যান্য জলচর প্রাণীর শরীরে। এরা আশ্রয়দাতার দেহতন্তু, রক্ত ইত্যাদি খেয়ে জীবনধারণ করে। এমন কি অনেক সময় এরা আশ্রয়দাতার মৃত্যুরও কারণ ঘটায়।

সিলিয়েটস প্রজাতির (যেমন স্লিপার অ্যানিম্যাল-কিউল—Slipper Animalcule: প্যারামেসিয়াম—Pramecium) সারা দেহ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রোমের মতো বস্তুতে ভরা। এই রোম আবার একই সঙ্গে আন্দোলিত হয়, যেমন ঘাসের ওপর বাতাস বইলে ঘাসের ডগাগুলো একই সঙ্গে তির-তির করে কাঁপে, যেন মনে হয় তাতে ঢেউ খেলে যাচ্ছে। সিলিয়েট্‌সরা রোমের এই কম্পনের সাহায্যেই চলাফেরা করে।

স্পঞ্জ

আদিমতম প্রাণীরা এককোষী হলেও স্পঞ্জ কিন্তু বহুকোষী, অর্থাৎ এদের দেহ একাধিক কোষ দিয়ে গঠিত। বেশির ভাগ স্পঞ্জই সমুদ্রে বাস করে। স্পঞ্জের দেহে একাধিক ছোট
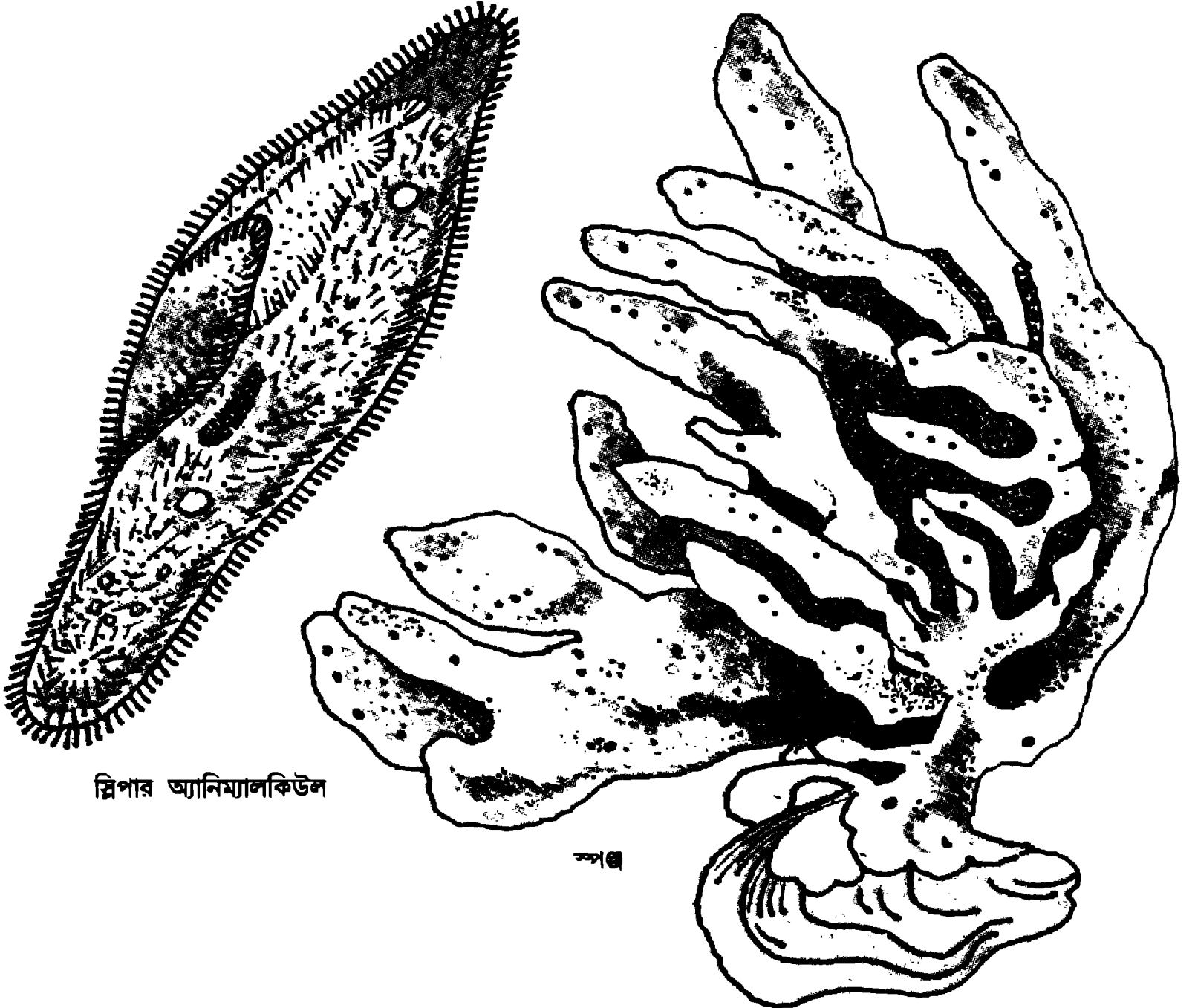
স্লিপার অ্যানিম্যালকিউল

স্পঞ্জ

ছোট ছিদ্র থাকে ; এই ছিদ্র দিয়ে স্পঞ্জ জল শোষণ করে। কারণ, জলে দ্রবীভূত বাতাস শ্বাসক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন হয়। স্পঞ্জের দেহের সবচেয়ে উপরিভাগে অপেক্ষাকৃত বড় একটি ছিদ্র থাকে। তাই দিয়ে সে বায়ু-শোষণের পর অপ্রয়োজনীয় যে জল থাকে, তা বের করে দেয়। স্পঞ্জকে চাপ দিলে সাময়িকভাবে এদের তথাকথিত দৈহিক বিকৃতি ঘটলেও চাপ তুলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার এরা আগের স্বাভাবিক অবস্থাতে ফিরে আসে। স্পঞ্জের দেহের ভেতরে তীক্ষ্ণমুখ-বিশিষ্ট সূচের মতো বস্তু থাকে যা সিলিকা বা স্পঞ্জিন দিয়ে তৈরি। স্পঞ্জের মৃত্যু হলে এই সূচীমুখগুলো রয়ে যায়। ফোম রবার আবিষ্কৃত হবার আগে মৃত স্পঞ্জ দিয়ে জল শোষণের ব্যবস্থা ছিল। শিল্পীরাও নিজেদের রঙ্ মাখা তুলি পরিষ্কার করতে মৃত স্পঞ্জের সাহায্য নিতেন।

স্পঞ্জের আকার সাধারণত ফুলদানীর মতো, তবে সময়ে সময়ে আবার অন্য রকমেরও হয়। স্পঞ্জের আকৃতি নির্ভর করে যে জলে স্পঞ্জ থাকে তার স্রোতের প্রাবল্যের ওপর।

সী-অ্যানিমন বা সাগর-কুসুম এবং জেলিফিশ

অনেক সময়ই সমুদ্রের তীরে বেড়াতে বেড়াতে চোখে পড়ে বহু পাপড়ি বিশিষ্ট ফুলের মতো একটি জিনিস। কৌতূহলী হয়ে তুললেই নজরে পড়ে, একটি নরম এবং দীর্ঘ বৃন্তের ওপরে ফুলের পাপড়িগুলো যেন ছড়িয়ে আছে। খানিকক্ষণ ধৈর্য ধরে লক্ষ্য করলে এও দেখা যায়, পাপড়িগুলো সামনে পেছনে আন্দোলিত হচ্ছে। এরই নাম সাগর-কুসুম বা সী-অ্যানিমন।

প্রকৃতপক্ষে এটি একটি সামুদ্রিক প্রাণী যার ব্যাসার্ধ বরাবর প্রতিসাম্য (Radial
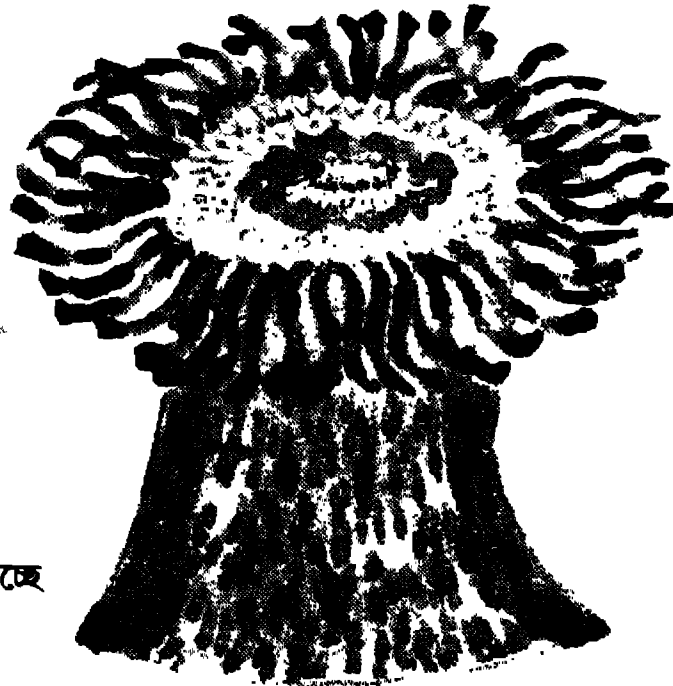
সী-অ্যানিমন বা সাগর-কুসুমের কর্ষিকায় ঘেরা মুখটি দেখা যাচ্ছে

সাগর-কুসুমের পার্শ্বচিত্র

Symmetry) আছে। আমরা যদি কোনো মানুষের প্রতিকৃতির ঠিক মাঝ বরাবর দাগ টানি, তাহলে দেখব, বাম দিকটি ডানদিকের প্রতিচ্ছবি (Mirror image) মাত্র। একেই বলে দ্বি-পার্শ্বিক প্রতিসাম্য (Bilateral Symmetry)। কিছু প্রাণীর ক্ষেত্রে ব্যাসার্ধ বরাবর প্রতিসাম্য লক্ষ্য করা যায়, অর্থাৎ যে-ভাবেই (লম্বালম্বি, আড়াআড়ি বা কোণাকুণি) মাঝখান দিয়ে দাগ টানা যাক না কেন, দেখা যাবে অর্ধাংশ দুটি হুবহু এক।

সী-অ্যানিমনের দেহ ফাঁপা। পাপড়ির মতো, উপাঙ্গগুলো ঠিক মাঝ বরাবর ওপরের দিকে অর্থাৎ আবর্তের ঠিক মাঝখানে তার মুখ। এই পাপড়ি বা কর্ষিকাগুলোতে (Tentacle)

আছে অসংখ্য দংশক কোষ। যখনই ছোট ছোট মাছ বা অন্য কোনো প্রাণী এর বেশি কাছাকাছি আসে তখন শত-সহস্র হুল ফোটার মতো তাদের দেহে অনুভূতি হয়। অর্থাৎ আক্রান্ত প্রাণীটির দেহ অসাড় হয়ে যায়। তখন কর্ষিকাগুলো ওই নিঃসাড় প্রাণীদেহকে আঁকড়ে ধরে ফেলে দেয় মুখের গর্তে। সী-অ্যানিমন বা সাগর-কুসুমের দেহের ফাঁপা অংশটি আসলে পাকস্থলী। খানিকক্ষণ বাদে খাদ্যের অপাচ্য অংশ ওই মুখ দিয়েই বাইরে বেরিয়ে আসে। সাগর-কুসুমের চোখ নেই, সুতরাং দৃষ্টিশক্তিও নেই।

এরা সাধারণত বৃন্তের মতো অংশটির সাহায্যে একই জায়গায় দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থেকে জীবনভর বসবাস করে। বংশবৃদ্ধির প্রয়োজন হলে এরা অ্যামিবার মতোই বিভাজন প্রক্রিয়ার সাহায্য নেয়। বিভক্ত হবার পর দেখা যায় প্রতিটি অংশই এক একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ প্রাণী।
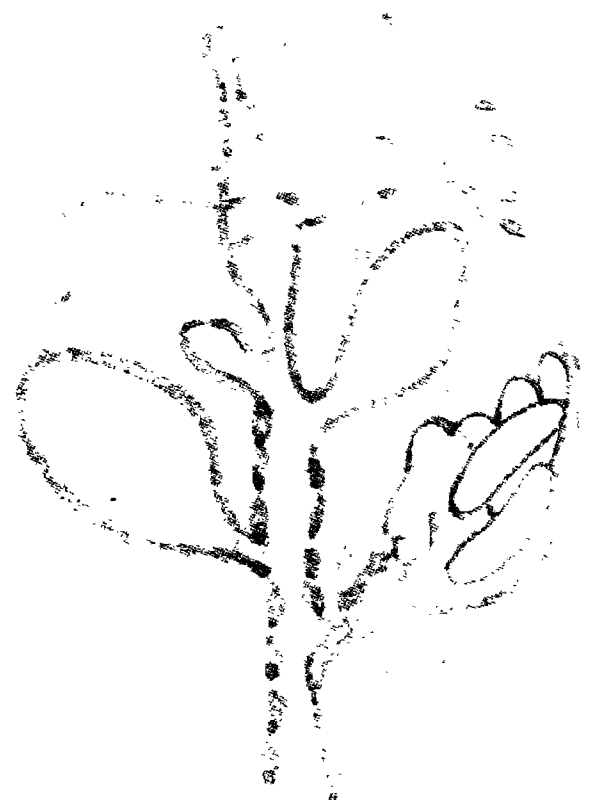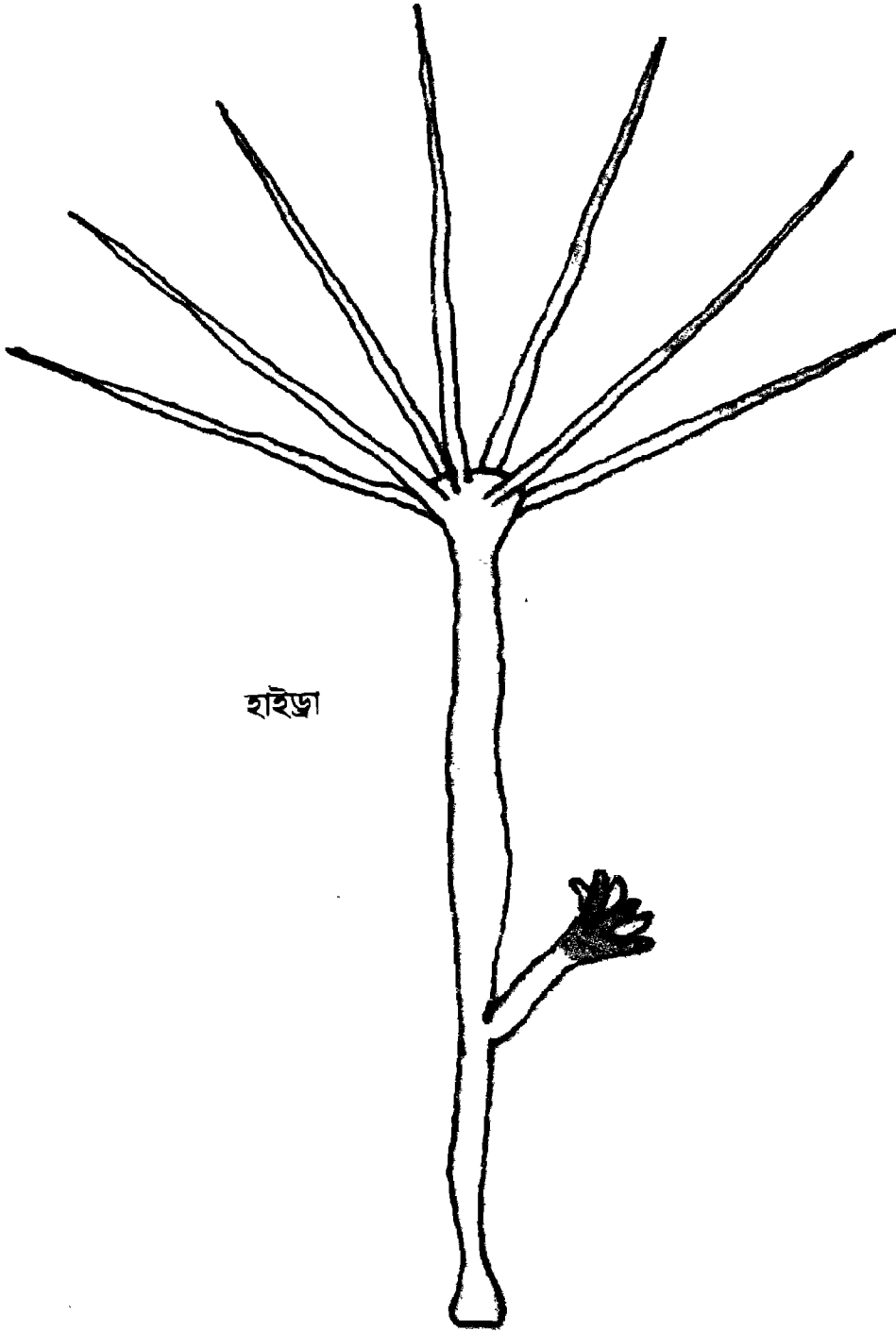
গোষ্ঠীবদ্ধ হাইড্রয়েডের একটি অংশ

এই সাগর-কুসুমকে যদি আরও ছোট আকারে কল্পনা করি, তাহলে কয়েক মিলিমিটার মাপের যে প্রজাতিটিকে পাই, তা হল, জলজ প্রাণী **হাইড্রা** (Hydra)। হাইড্রাও স্বয়ং-সম্পূর্ণ প্রাণী, আলাদা আলাদা ভাবে বাসবাস করে, তবে অনেক সময় আবার এরা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন-যাপনেও অভ্যস্ত। গোষ্ঠী বানাবার সময় একটি হাইড্রা তার শরীরের একটা অংশ শাখার মতো বের করে দেয়, তার ওপর জন্ম নেয় দ্বিতীয় একটি হাইড্রা। এর থেকে নানান উপশাখায় ক্রমান্বয়ে জন্মায় একাধিক হাইড্রা—পুরো গোষ্ঠীটি দেখতে অসংখ্য শাখা-প্রশাখা সমৃদ্ধ পালকের মতো। যদিও এরা আকারে খুবই ছোট কিন্তু কয়েকটি বিশেষ প্রজাতির দংশক কোষ এতই বিষাক্ত যে কোনোভাবে আমাদের হাতে লেগে গেলে লাল পিঁপড়ের কামড়ের মতোই জ্বালা অনুভব করব।

সাগর-ফলক (Sea-pen) প্রাণীটির শরীরের দুই দিকেই সরু অংশ থাকে, ঠিক হাঁসের পালকের তৈরি কলমের মতো। সাগর-পালক (Sea-fan)-এর সমস্ত শরীর জুড়ে অসংখ্য শাখা, প্রতিটিই মূল কান্ড বা দেহ থেকে বেরিয়েছে। এই শাখাগুলো প্রাণীটিকে পাথরে আটকে থেকে জীবনযাপন করতে সাহায্য করে। শাখাগুলো পরপর এমনভাবে সংলগ্ন, মনে হয়, একটা হাত পাখা মেলে ধরা হয়েছে।
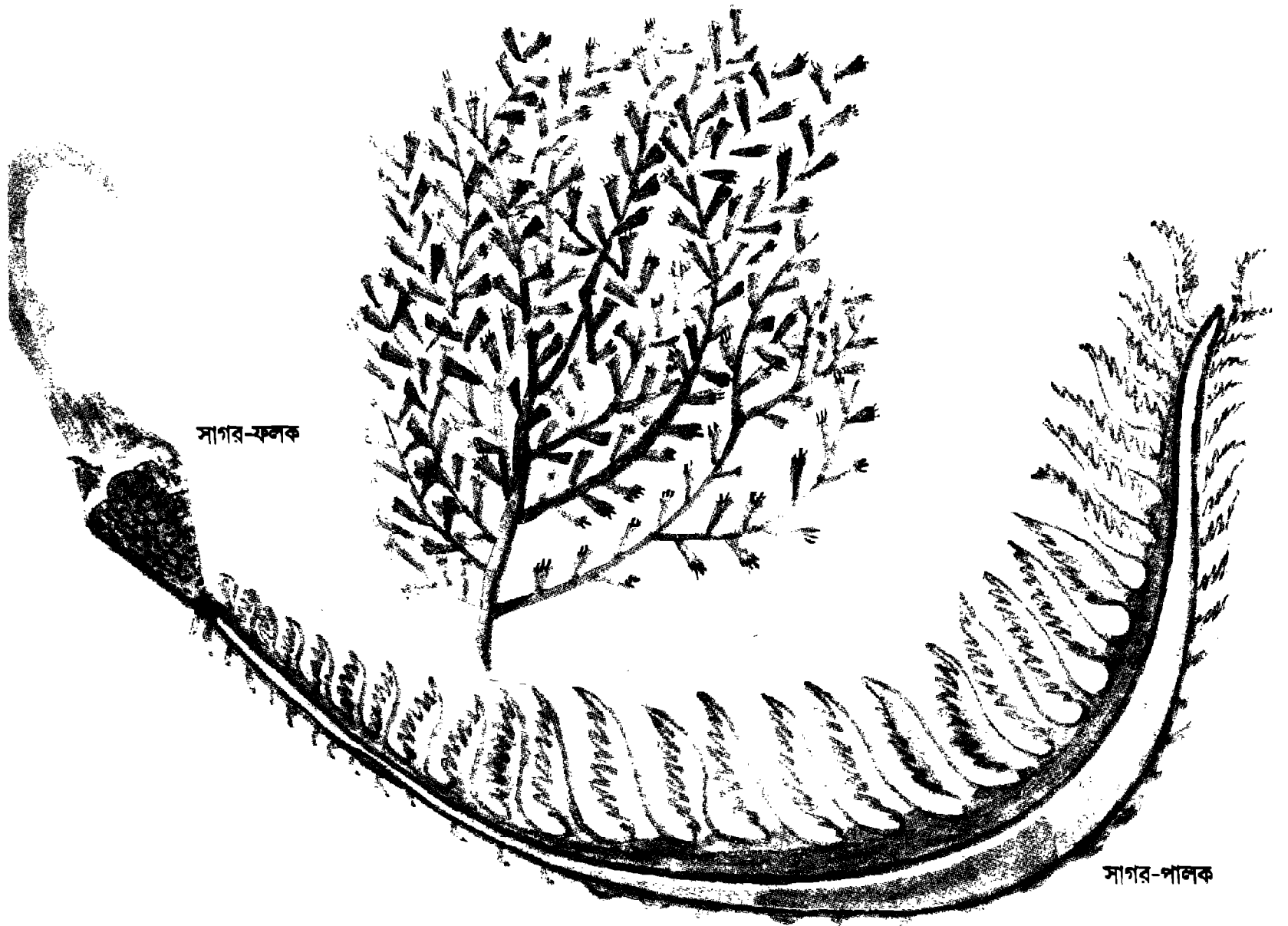
প্রবাল কীটের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম। এই প্রজাতির প্রাণীরা সাগরের জল থেকে চুণ-জাতীয় পদার্থ সংগ্রহ করে নিজেদের আশ্রয় তৈরি করে, যার গায়ে থাকে পেয়ালার মতো ছোট ছোট গর্ত। কীটগুলো সাধারণত আশ্রয় নেয় এই পেয়ালার মধ্যে। রাতের অন্ধকারে অবশ্য নির্ভয়ে তারা সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। প্রবাল কীটদের দেহতন্তুতে অনেক সময়েই থাকে এককোষী উদ্ভিদ। এই এককোষী উদ্ভিদ কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও প্রবাল কীটের বর্জ্য পদার্থ দিয়ে নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য সংস্থান করে। প্রবাল প্রাচীর তৈরি করে যে-সব প্রবাল কীট, তারা থাকে সমুদ্রের অগভীর অংশে, যেখানে এই সব উদ্ভিদ পর্যাপ্ত সূর্যালোক পায়। প্রবাল নানা আকৃতির হয়। যেমন হরিণের শিঙের মতো 'স্ট্যাগহর্ন কোরাল' (Staghorn Coral), বুরুশের মতো 'ব্রাশ কোরাল' (Brush Coral), 'স্তম্ভাকৃতি পিলার কোরাল' (Pillar Coral), আঙুলের আকারের 'ফিঙ্গার কোরাল' (Finger Coral), ফুলের মতো 'ফ্লাওয়ার কোরাল' (Flower Coral), গাছের মতো 'ট্রী কোরাল' (Tree Coral), গুচ্ছাকৃতি 'ক্লাস্টার কোরাল' (Cluster Coral), ইত্যাদি। মস্তিষ্কের আকারের 'ব্রেন কোরাল' (Brain Coral)-এর আকার হয় গোল আর তাতে ঠিক আমাদেরই মস্তিষ্কের মতো কুঞ্চন বা খাঁজ আছে। প্রবাল কীটের রঙ নানান রকমের হয়। রামধনুর মতো বর্ণচ্ছটায় এরা মনকে আবিষ্ট করে দেয়। প্রবাল প্রাচীর দেখতে খুবই মনোরম কিন্তু যখন প্রবালকীটের পলিপস্ বা পুষ্টি-সংগ্রাহক অঙ্গটি (Polyp) মারা যায় তখন শুধুই তার সাদা কঙ্কাল বা কাঠামো পড়ে থাকে। প্রবাল কীট নিজে আকারে ছোট হলেও বিরাট আকারের প্রাচীর তৈরিতে তারা পারদর্শী। কেরলের দক্ষিণে আবর সাগরের মাঝখানে লাক্ষাদ্বীপ পুরোপুরি প্রবালের তৈরি প্রবালদ্বীপ। কচ্ছের উপসাগরীয় অঞ্চলে ওখা আর পিরোটান বন্দরে এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের চারদিকে ঝালরের মতো প্রবাল প্রাচীর দেখতে পাওয়া যায়।
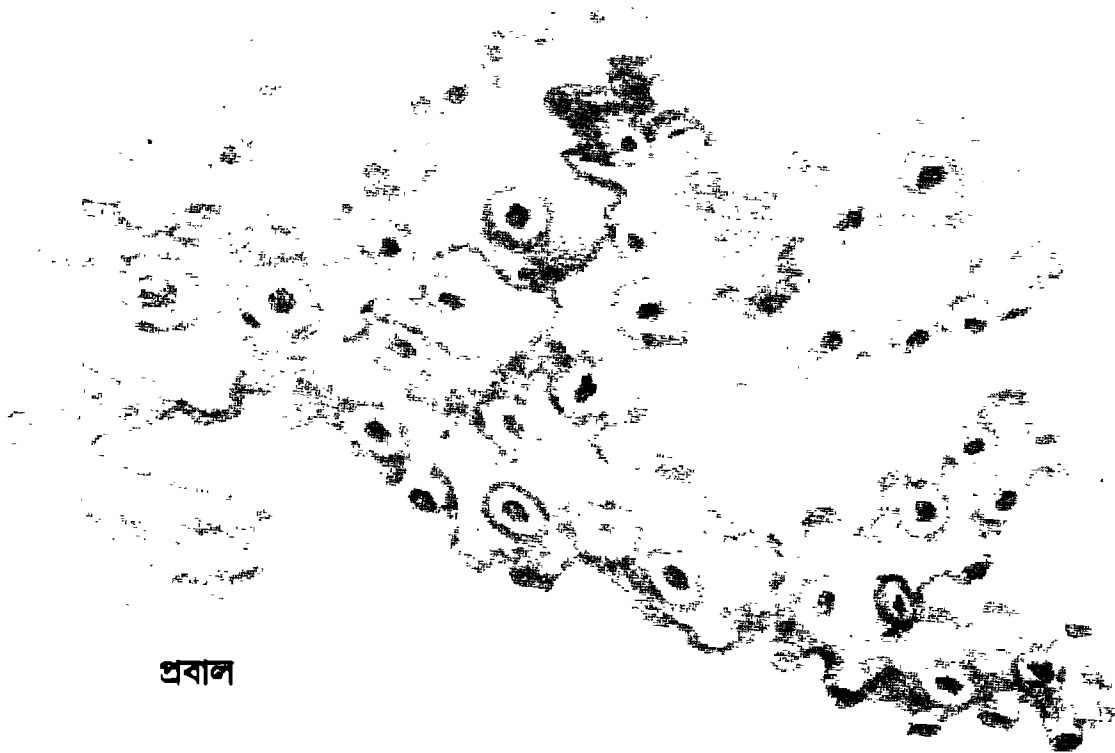
প্রবাল

পলিপস্‌রা (Polypes) দেখতে এক রকম হয় না, এমন কি এরা কাজও করে আলাদা আলাদা। পর্তুগীজ ম্যান-অব-ওয়ার (Portuguese man-of-war) একটি পলিপ (Polype) ভাসমান অবস্থা বজায় রাখে, অন্যগুলো তাদের লম্বা কর্ষিকার সাহায্যে খাদ্য সংগ্রহ করে। এদের কষিকাতেও (Tentacles) থাকে অগুনতি দংশক কোষ ; আবার বাকিরা বংশবৃদ্ধির সহায়ক। পর্তুগীজ ম্যান-অব-ওয়ার বড় বড় সামুদ্রিক জীবকে কাবু করে ফেলতে পারে,
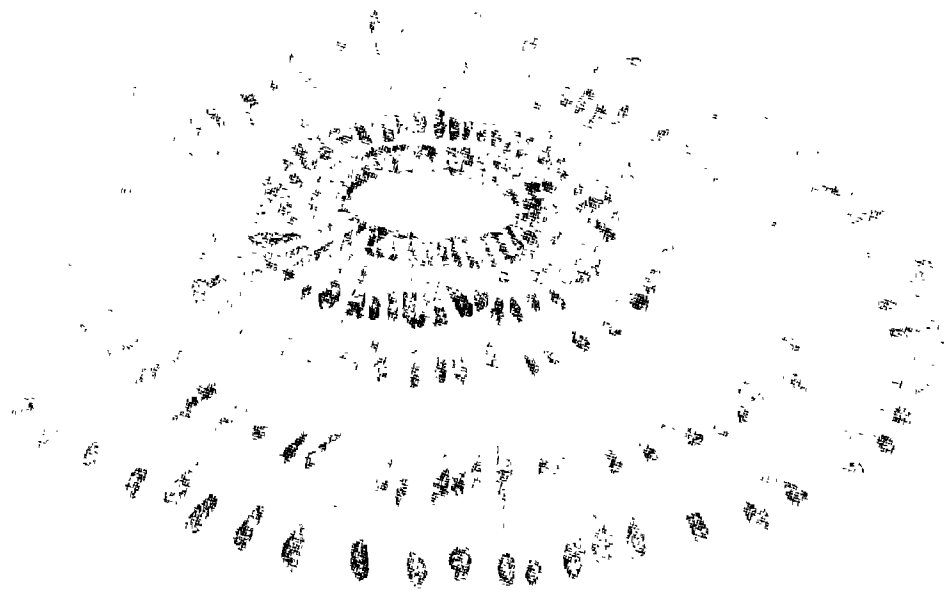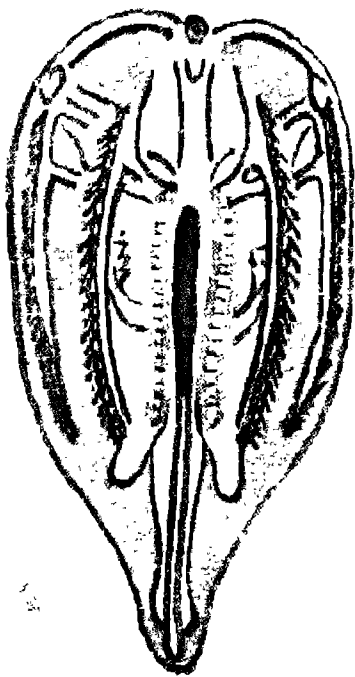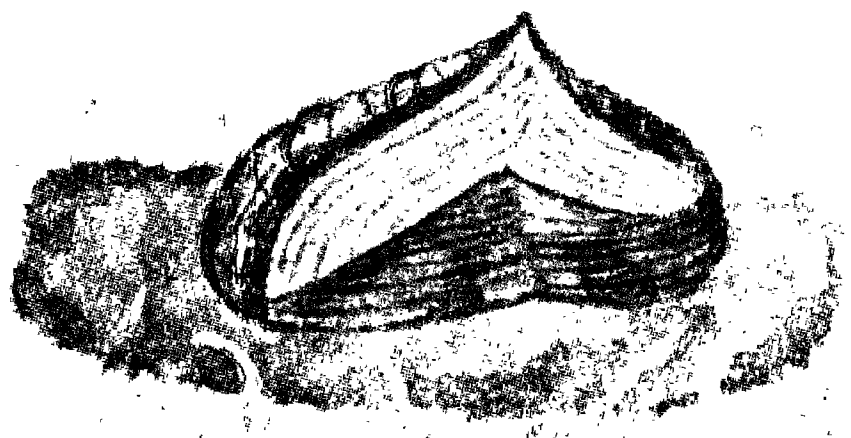
কিন্তু একটি মাত্র মাছ **নমিয়ুস** (Nomeus) এদের বিষে বিকল হয় না, বরং নমিয়ুস আশ্রয় নেয় পর্তুগীজ ম্যান অব-ওয়ারের কর্ষিকার ভেতরেই।

পরপিটা (Porpita) দেখতে গাঢ় নীল এবং চ্যাপটা চাকতির মতো, অনেকটা এক টাকার মুদ্রার মাপের। এরাও পলিপসের গোষ্ঠীবদ্ধ রূপ। বাই-দ্য উইন্ড সেইলারের (by the wind-sailor) ক্ষেত্রে চাকতিটির মাথায় চ্যাপ্টা লম্বাটে মাস্তুলের মতো অংশ থাকে, যা বাতাসের টানে প্রাণীটিকে ভেসে যেতে সাহায্য করে।

সাগর-কুসুমেরই মতো আর একটি প্রাণী **জেলিফিশ** (Jelly fish)। কিন্তু সাগর-কুসুমদের মতো একই জায়গায় স্থির হয়ে থাকে না। জেলিফিশ মন্থর গতিতে চলাফেরা করে। এদের দেহ নরম, অর্ধস্বচ্ছ সাদাটে। এদের স্পর্শ করলে মনে হবে, যেন তালশাঁস। ঘন্টার আকারের এই জেলিফিশ যখন পেশী সংকোচন করে, তখন সেই চাপে শরীরের চারপাশ থেকে জল বেরিয়ে আসে ফিন্‌কি দিয়ে আর সেই ধাক্কায় জেলিফিশ বিপরীত মুখে সামান্য সরে যায়। ঘন্টাটার ঠিক মাঝখানে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে জেলিফিশের মুখ আর চারদিকে থাকে চার পাঁচটি কর্ষিকা (tentacla)। এই সব কর্ষিকাতেও রয়েছে দংশক কোষ। চকচকে শরীরের ভেতরে দেখা যায় চারটি কমলা রঙের জননেন্দ্রিয়। এরাই শুক্রাণু আর ডিম্বাণু জলে ক্ষরণ করে তা থেকে জন্ম নেয় নতুন জেলিফিশ। কিন্তু জেলিফিশ এতই বিষাক্ত যে এদের দংশনে মানুষের মৃত্যুও হয়। এদের শরীরের ব্যাস এক সেন্টিমিটার থেকে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে।

জেলিফিশেরই দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি হল **কোম্ব-জেলি** (Comb-Jellie)। এরাও চকচকে, নরম। কিন্তু এদের শরীরে আছে আটটি সারিতে সাজানো সিলিয়া (Celia) বা রোঁয়া, যার সাহায্যে এরা জলে সাঁতার কাটে। এক জোড়া লম্বা এবং চুলের মতো আঠালো কর্ষিকার সাহায্যে এরা খাদ্য সংগ্রহ করে। অনেক কোম্ব-জেলির আকার গোল আঙুরের মতো, কিন্তু ভেনাসেস গার্ডল (Venus's girdle) খুবই লম্বা আর চ্যাপটা অর্থাৎ দেখতে ঠিক কোমরবন্ধের মতো।

শ্যাওলা জাতীর প্রাণী

মস অ্যানিম্যালসের পরিচিতি সী ম্যাট (Sea mat) হিসেবেও বটে। এরা গোষ্ঠীবদ্ধ জীব, তবে চট করে নজরে পড়ে না। ধূসর বা হলদেটে গুঁড়োর মতো এরা ছড়িয়ে থাকে পাথরে, ঝিনুকের খোলসে বা স্পঞ্জের গায়ে। এদের মুখের চারদিকে অনেক কর্ষিকা থাকে। কর্ষিকার গায়ে আছে সূক্ষ্ম রোম, যা খাদ্য সংগ্রহ করে মুখ-গহ্বরে নিক্ষেপ করে। এদের একনজর

দেখলে পলিপ গোষ্ঠী বলে ভুল ধারণা হতে পারে, যদিও ওই গোষ্ঠীর সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক নেই। অনেক সী ম্যাট গোষ্ঠী প্রায় 100 সেন্টিমিটার পর্যন্তও দীর্ঘ হয়।
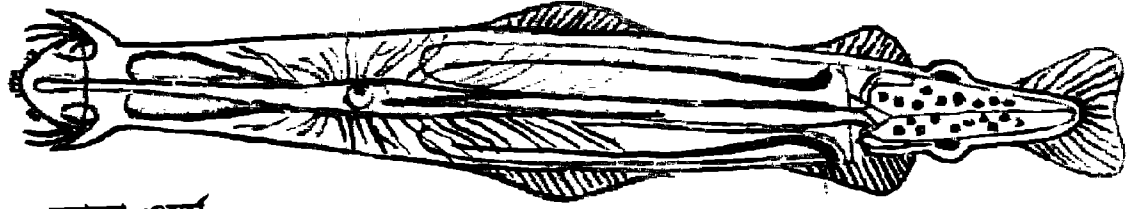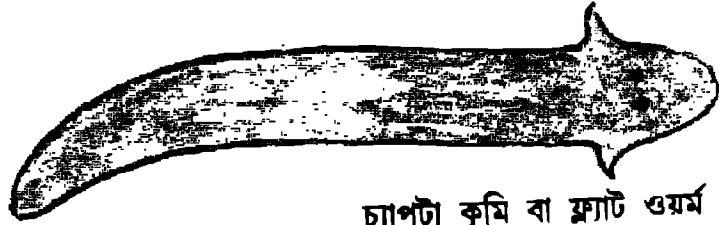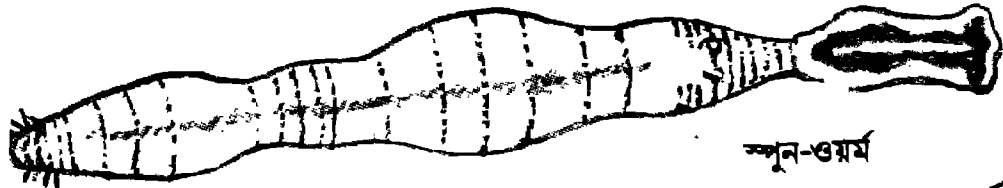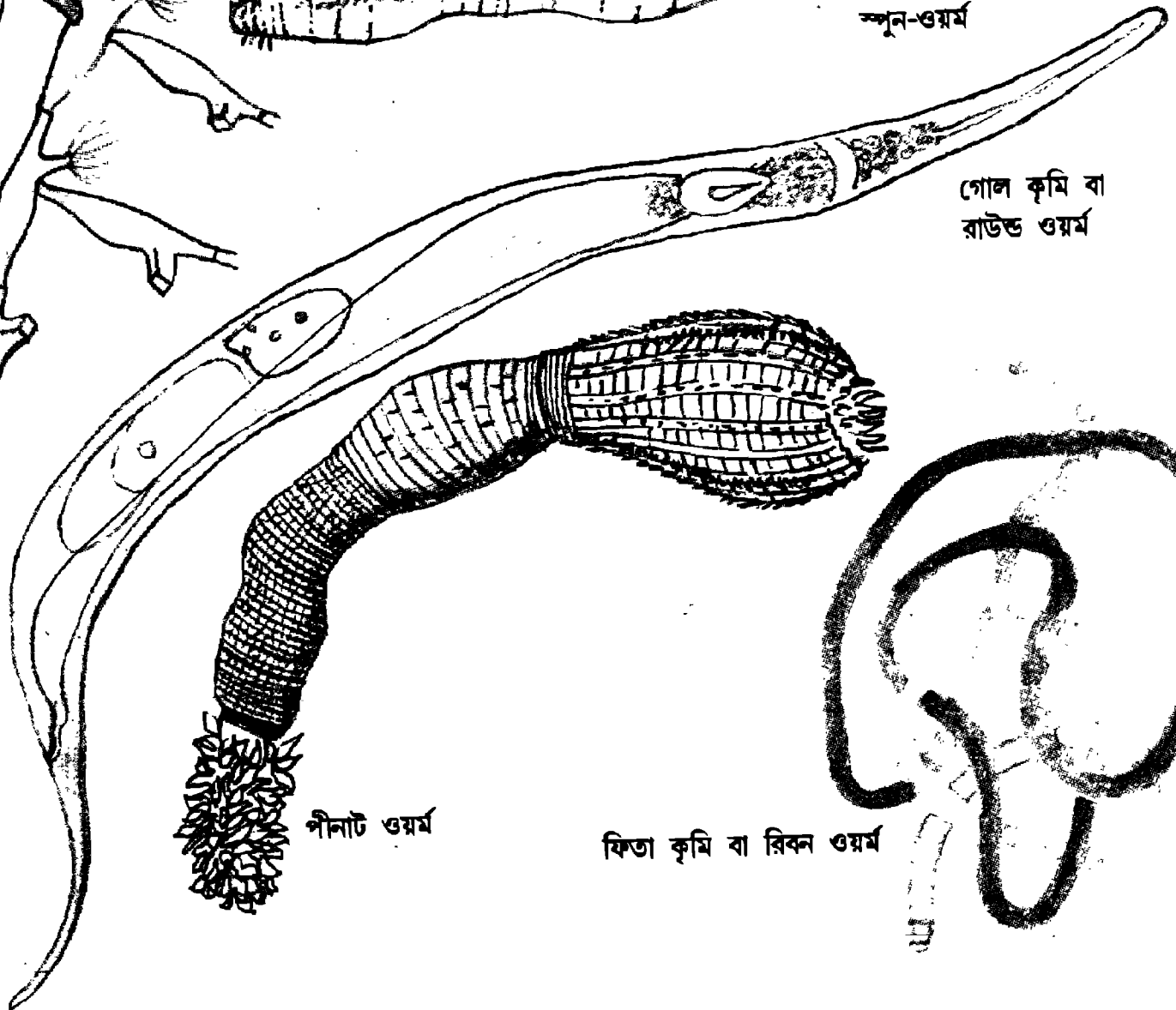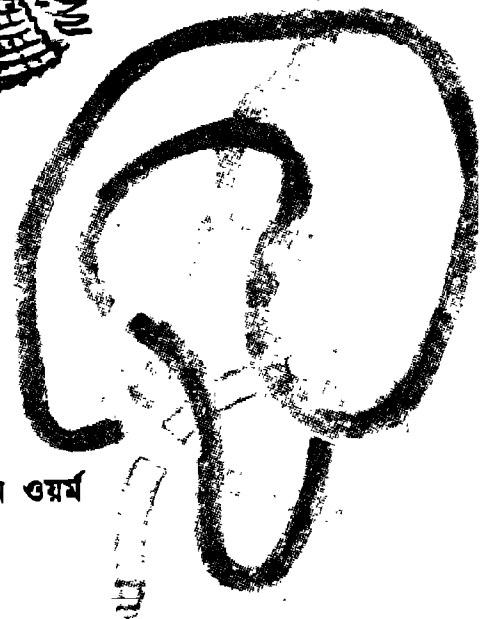
ওয়র্মস (Worms)

ওয়র্ম কথাটি ব্যাপক অর্থে নানান জাতের প্রাণীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। সেটা তারা পরস্পরের সম্পর্কযুক্ত না হলেও। চ্যাপটা কৃমি বা ফ্ল্যাট ওয়র্ম (Flat worm), গোলকৃমি বা রাউন্ড ওয়র্ম (Round Worm), ফিতাকৃমি বা রিবন ওয়র্ম (Ribbon Worm), পীনাট ওয়র্ম (Peanut Worm : Sipuncula), স্পুন ওয়র্ম (Spoon Worm) আর অ্যারো ওয়র্ম (Arrow worm) এসব এক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের সকলের দেহেই দ্বিপার্শ্বিক প্রতিসাম্য দেখা যায়। ছবিতে এদের দেখানো হল।

অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের ওয়ার্মের শরীর বহু খন্ডে বিভক্ত। আমাদের সকলের অতি পরিচিত হল কেঁচো বা আর্থ ওয়র্ম (Earth Worm)। এরই জলচর জাতভাই হল, টিউবিফেক্স (Tubifex)। নালা নর্দমায় এদের দেখা যায়। এরা পাঁকে মাথা ডুবিয়ে থাকে আর দেহটা কুন্ডলী পাকিয়ে বেঁকিয়ে চুরিয়ে চলাফেরা করে। আবর্জনার ভেতরে যে জৈব পদার্থ পাওয়া যায়, তাই এদের খাদ্য। যেহেতু যে-জলে এরা বাস করে, তাতে অক্সিজেনের পরিমাণ কম, তাই এদের রক্ত হয় লাল। (মেরুদন্ডহীন প্রাণীদের ক্ষেত্রে এটি এক বিশেষ ব্যতিক্রম, বেশির ভাগ মেরুদন্ডহীন প্রাণীর রক্ত কিন্তু সাধারণত বর্ণহীন বা হালকা নীল।)

বহু সামুদ্রিক ওয়র্মের দেহের প্রতিটি খন্ডে এক জোড়া করে নৌকোর দাঁড়ের মতো রোমশ উপাঙ্গ থাকে যার সাহায্যে এরা স্বচ্ছন্দে সাঁতার কাটতে পারে।

এই সব ওয়র্ম নিয়ে নাড়াচড়া করবার সময় যথেষ্ট সাবধানতা দরকার। এদের মধ্যে অনেকেই চোয়ালের সাহায্যে কামড় বসাতে পারে। ইউরিথো (Curythoe) ওয়র্মটির দাঁড়ের মতো উপাঙ্গে গোছা গোছা সরু পাতলা কাচের মতো চকচকে ছোট ছোট শক্ত লোম থাকে, এগুলি দেখতে দাঁত মাজার ব্রাশের মতো। এই ওয়র্মটিকে ধরলে লোমগুলো সঙ্গে সঙ্গে ছুঁচের মতো শরীরে বিঁধে যায়।
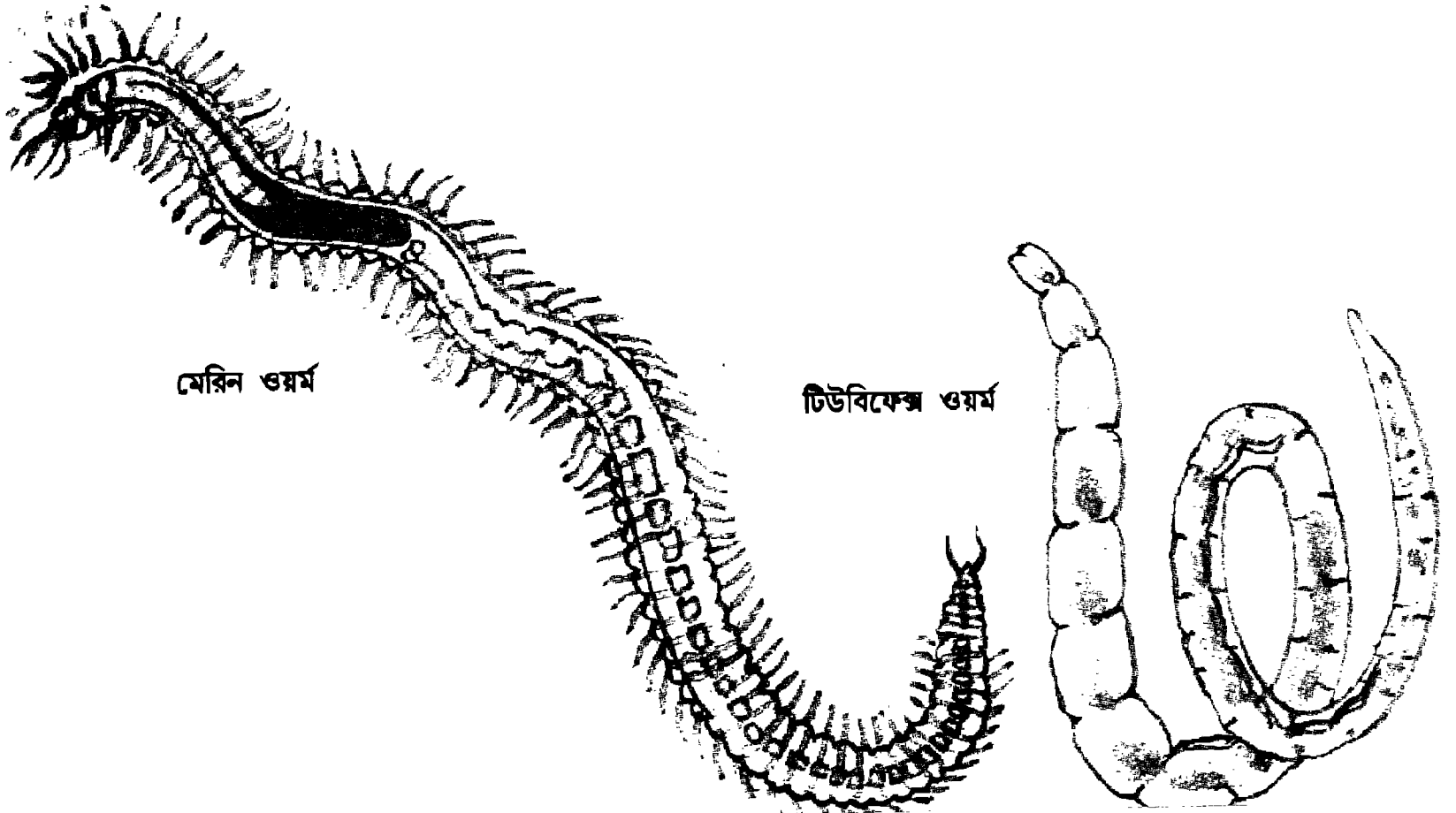
ফ্যান ওয়র্ম (Fan Worm) আর ফেদার-ডাস্টার ওয়র্ম (Feather-duster Worm) সাঁতার কাটে না, এরা কাদামটি বা চুণ জাতীয় জিনিস দিয়ে নল তৈরি করে তার ভেতরে বসবাস করে। এদের মাথায় ওপর একাধিক সরু লম্বা সুতোর মতো কর্ষিকা থাকে, যাতে সংগ্রহ করা খাদ্যকণা আটকে থাকে। এদের চোখ আছে, তবে তা উন্নত মানের প্রাণীদের
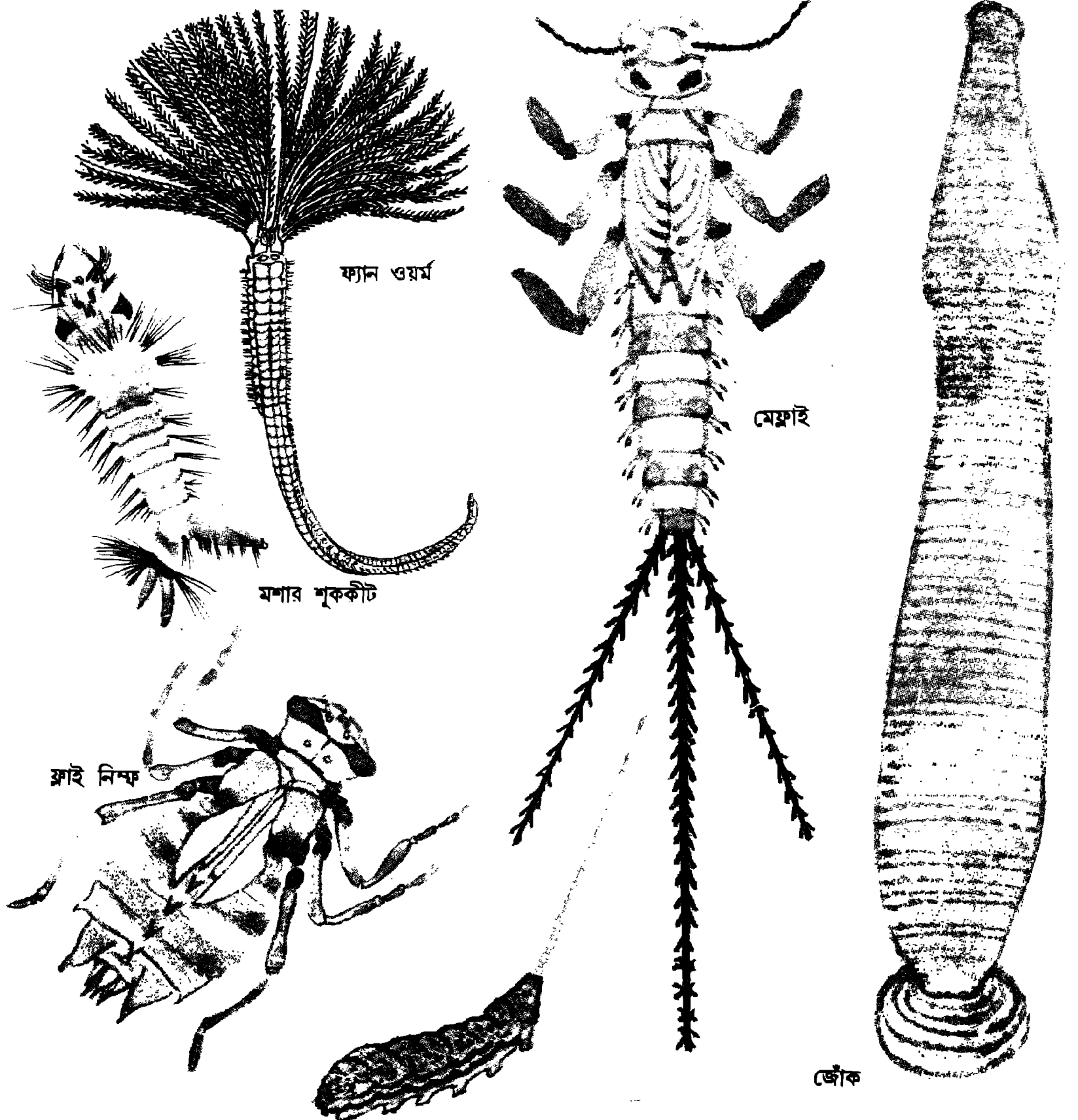
চোখের মতো নয় বলা যায়, সে-সবের প্রাথমিক সংস্করণ। এই চোখের সাহায্যে এরা আলো অনুভব করতে পারে। তাই আশেপাশে সামান্য ছায়া পড়লেই এরা তাড়াতাড়ি সতর্ক হয়ে নলের মধ্যে ঢুকে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

জোঁক জাতীয় প্রাণীর দেহও খন্ডাংশে বিভক্ত। কিছু জোঁক জলচর এবং এরা মাছ, কচ্ছপ, শামুক, কাঁকড়া এবং নানা জাতের কীটপতঙ্গের দেহের রস ও রক্ত পান করে জীবন ধারণ করে।

কীটপতঙ্গ

অনেক কীটপতঙ্গ সারাজীবনই জলের নীচে কাটিয়ে দেয়। আবার যারা পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় স্থলচর হয়ে যায় তারাও শূককীট অবস্থায় জলেই বাস করে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর উদাহরণ হিসেবে স্টোন ফ্লাই (Stone fly), অলডার ফ্লাই (Alder fly), মে ফ্লাই (May fly) উল্লেখযোগ্য। এদের প্রত্যেকেরই শূককীট দীর্ঘজীবী (দুই থেকে তিন বছর), কিন্তু পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় স্বল্পায়ু (মে ফ্লাই মাত্র কয়েক ঘন্টা বাঁচে)।

কীটপতঙ্গ আর তাদের শূককীট জলের নীচে যখন বাস করে, তখন অভিনব উপায়ে তারা প্রয়োজনীয় বাতাস সংগ্রহ করে। কিছু কিছু জলপোকা (Aquatic bug)-এর শূককীট পুকুরের একেবারে তলায় থাকে। এরা লম্বা ও নমনীয় নলের মতো দেহাংশটি তুলে দেয় জলের ওপরের তলে। কিছু কিছু প্রজাপতি ও মথের শূককীট দুটি পাতা একসঙ্গে জুড়ে নিয়ে তাঁবু খাটিয়ে নেয়। তারপর যখন জলের নীচে যায়, সঙ্গে তাঁবুটিও নিয়ে যায়। ওই তাঁবুতে ভর্তি থাকে টাটকা বাতাস।

রিফ্‌ল বীট্‌ল (Riffle beetle) রোমশ দেহের কীট। এরা যখন জলের নীচে যায়, তখন এই রোমগুলোর ফাঁকে ফাঁকে বাতাস আটকে থাকে। বীটল এই বাতাসই নিজেদের শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজে ব্যবহার করে। হোয়্যারলিগিগ বীটল (Whirligig beetle) জলে ডুব দেওয়ার সময় বুদবুদ সৃষ্টি করে। সেই বুদবুদ বাতাসে ভরা। কিছু জাতের জলপোকা দুই ডানার ফাঁকে বাতাস ধরে রাখে। ওয়াটার বোটম্যান (Water boatman) সর্বাঙ্গে বাতাসভর্তি বুদবুদ বয়ে নিয়ে বেড়ায়।

ড্রাগন ফ্লাই আর **ড্যামসেল ফ্লাই** (Damsel fly)-এর শূককীটের মুখের নীচে আছে সাঁড়াশির মতো অংশ, যখনই আশেপাশে কোনো শিকারের সন্ধান মেলে, ওই সাঁড়াশি খুলে যায় আর শিকার ফাঁদে আটকা পড়ে। তারপর সাঁড়াশি আবার মুখের ভেতর ঢুকে যায় শিকার করা খাদ্য গিলে ফেলার জন্য।

মশা, ক্রেন ফ্লাই (Crane fly) আর মিজ (Midge) বা ডাঁশ জাতীয় পতঙ্গ বাতাসে ওড়ে বটে, কিন্তু ডিম পাড়ে জলে এবং এদের শূককীটও জলচর। এই শূককীটকে রিগলার (Wriggler) বলা হয়। এরা জলের ঠিক নীচে চুপ করে পড়ে থাকে। এরা দেহ সংলগ্ন

ছোট নলাকৃতি শ্বাসযন্ত্রের সাহায্যে শ্বাস প্রশ্বাস নেয়। কিন্তু জলে সামান্যতম আলোড়ন হলেই তাড়াতাড়ি এঁকে বেঁকে গভীর জলে নেমে গিয়ে খানিকক্ষণ কাটিয়ে আসে।

একমাত্র কীট যা সমুদ্রে দেখা যায়, তা হল হ্যালোবেটস (Halobates)। সমুদ্রতট থেকে বহু কিলোমিটার দূরে সমুদ্রের জলের ওপর এদের হেঁটে বেড়াতে দেখা যায়।

জোড়া অঙ্গের প্রাণী

স্থলে যেমন কীটপতঙ্গদেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা ; জলের সাম্রাজ্য তেমনই তাদের জাতভাই ক্রাস্টেসিয়ারদের (Crustacea) দখলে। ওয়র্মের মতো এদের দেহও খণ্ডিত অংশের সমষ্টি তবে খণ্ডসংখ্যা অনেক কম। এদের পায়ে নানান অংশ জোড়া আর শরীর শক্ত বর্মের মতো চিটিন (Chitin) পদার্থের আবরণে মোড়া। চিটিন অনেকটা গরুমোষের শিঙ বা আমাদের নখ যে-রকম পদার্থে তৈরি, সেই রকম। এই জাতের প্রাণীদের দেহের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত থাকে বাইরের ওই শক্ত আবরণটির জন্যই। তাই একই আকার এরা কয়েক সপ্তাহ বা মাস ধরে বজায় রাখে। তারপর একদিন খোলস ফেটে নরম শরীরের প্রাণীটি বাইরে বেরিয়ে আসে, পেটভরে জল খায়। তারপর জলের চুণ-জাতীয় জিনিস সংগ্রহ করে নতুন খোলস বানানো শুরু করে। বাইরের এই খোলস নরম থাকতে থাকতেই প্রাণীটির আকার হঠাৎই আবার খানিকটা বেড়ে যায়। আর কয়েক দিনের মধ্যেই নতুন খোলস শক্ত হয়ে ওঠে। যতদিন না নতুন খোলস বানাবার জন্য প্রাণীটি পুরনো খোলস কেটে বাইরে বেরিয়ে আসছে, ততদিন তাদের আকারের আর কোনো পরিবর্তন ঘটে না। এই রকম বারবার খোলস বদল করাকে বলা হয় নির্মোচন (Moulting)।

অনেক ক্রাস্টেসিয়ান প্রাণী ইচ্ছে মতো জোড়া দেওয়া দেহের অঙ্গ ভেঙেও ফেলতে পারে। যেখানে অঙ্গটি ভেঙে যায়, সেখানে রক্তের জালিকা কুচকে গিয়ে রক্তক্ষরণ বন্ধ করে দেয়। ফলে তাতে প্রাণীটির দৈহিক কোনো ক্ষতি হয় না। কখনও জোড় দেওয়া পা যদি শত্রু কোনো ভাবে চেপে ধরে, তবে ক্রাস্টেসিয়ান চট করে আক্রান্ত পায়ের অংশটিকে ভেঙে শরীর থেকে তা আলাদা করে ফেলে চলে আসে। শত্রুর কাছে তখন পড়ে থাকে তার পায়ের খানিকটা ভাঙা অংশ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার তার শরীরে নতুন পা গজায়।

সমুদ্রে যে-সব এই শ্রেণীর প্রাণী দেখা যায়, তাদের মধ্যে কোপিপড (Copepod) অন্যতম। এদের আকার ছোট, মাত্র কয়েক মিলিমিটার। এরা সমুদ্রের জলে অবাধে বিচরণ করে। যেমন তৃণভূমিতে গবাদি পশু দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি। জলে ভাসমান লতাপাতাই এদের খাদ্য। এই কোপিপডদের আবার খেয়ে ফেলে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের জলচর প্রাণী ও মাছ। অবশ্য দ্রুতহারে বংশবৃদ্ধি করে সেই ঘাটতি এরা অতি সহজেই পুষিয়ে
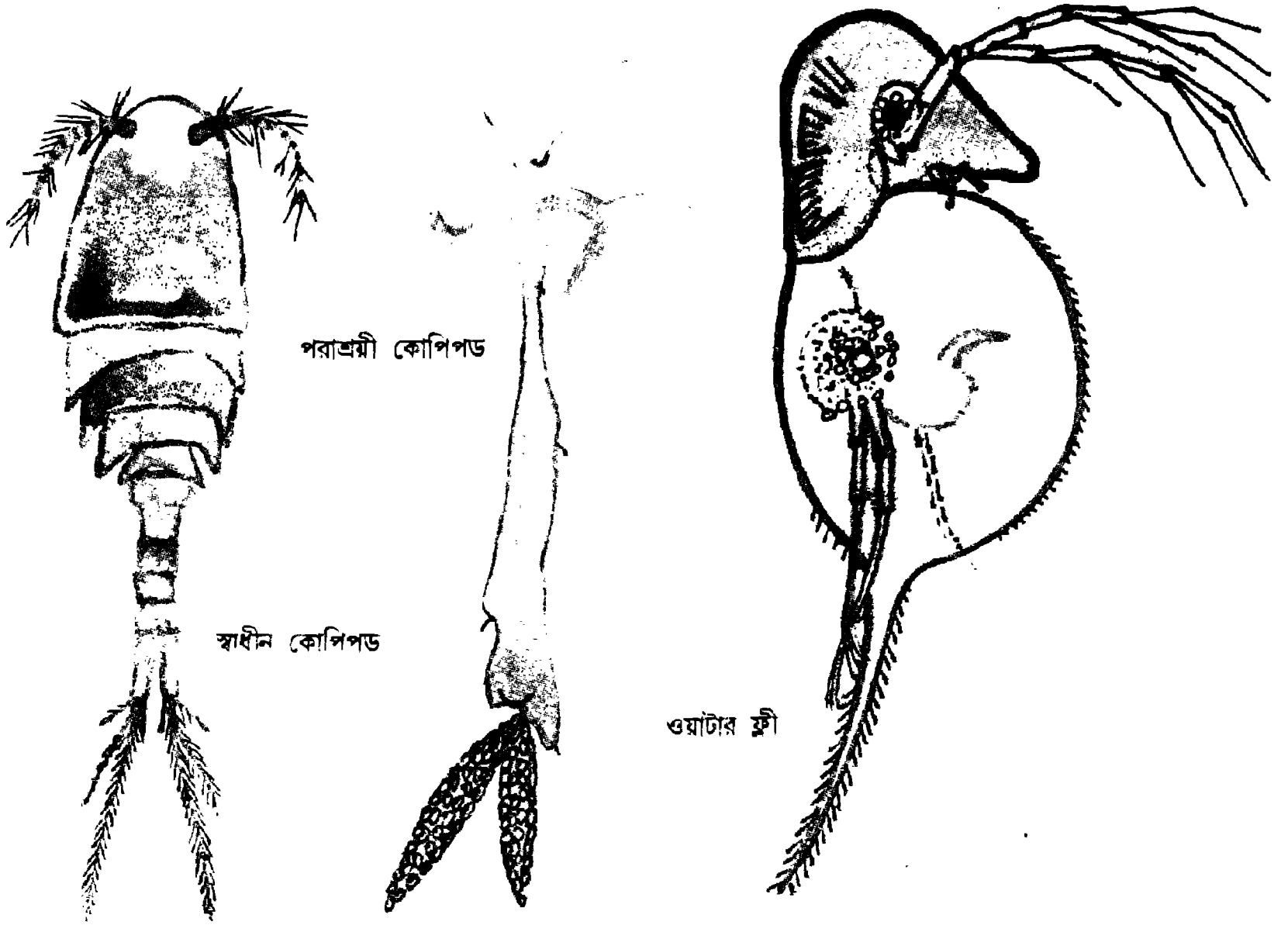
নেয়। এমন কি দিনে যদি বেশ কয়েক হাজার কোপিপডের মৃত্যু হয়, তাহলেও দেখা যায়, এদের সংখ্যা কমে না।

অনেক কোপিপড স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করে না। এরা মাছের দেহে পরজীবী হিসেবে বসবাস করে। মাছের চামড়ায়, কানকোয় এরা আশ্রয় নেয় আর মাছের দেহের রস ও রক্ত পান করে বেঁচে থাকে। বেশ কিছু জাতের কোপিপড মিঠে জলেও দেখা যায়।

কোপিপডের মতোই অসংখ্য হল **ওয়াটার ফ্লী** (Water flea)। এদের অবশ্য মূল বাসস্থান মিঠে জলে। এমনকি জল শুকিয়ে গেলেও এদের জীবন ধারণে কোনোই অসুবিধে হয় না। স্ত্রী ওয়াটার ফ্লী ডিম পাড়ে, তবে তার জন্য পুরুষ সঙ্গীর প্রয়োজন হয় না। জল শুকিয়ে গেলে মা-প্রাণীটি মরে যায়, কিন্তু তার ডিম রয়ে যায় একেবারে নীচের কাদার স্তরে। বর্ষার জলে পুকুর যখন আবার ভরে ওঠে, তখন সেই ডিমগুলো আপনা আপনি ফুটে যায়।

এই ধরনের ঘটনা **ফেয়ারী শ্রিম্পের** (Fairy Shrimp) ক্ষেত্রেও ঘটে। এদের ডিমগুলো

সুন্দর রঙের। প্রসবস্থল ছোটখাটো জলা, ডোবা ইত্যাদি। যেখানেই বৃষ্টির জল জমে সেখানেই এরা ডিম পাড়ে। এরা চিৎ হয়ে অসংখ্য ক্ষুদে ক্ষুদে পায়ে সাঁতার কাটে। জল শুকিয়ে গেলে এরা মারা যায় বটে, তবে মারা যাবার আগেই ডিম পাড়ে।

একই ধরনের জীব **ব্রাইন শ্রিম্প** (Brine Shrimp) বা নোনা জলের চিংড়ি। সমুদ্রের জল যেখানে সংগ্রহ করে রাখা হয় সূর্যের তাপে শুকিয়ে নুন তৈরির জন্য—সেখানে এদের বাস। অত্যন্ত লবণাক্ত জলেও এরা বেঁচে থাকতে পারে। এদের ডিম শুকনো অবস্থায় দীর্ঘদিনের জন্য সংরক্ষণ করা যায়। শুকনো ডিম আবার নোনা জলে দিলে এক দিনের মধ্যে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে আসে।
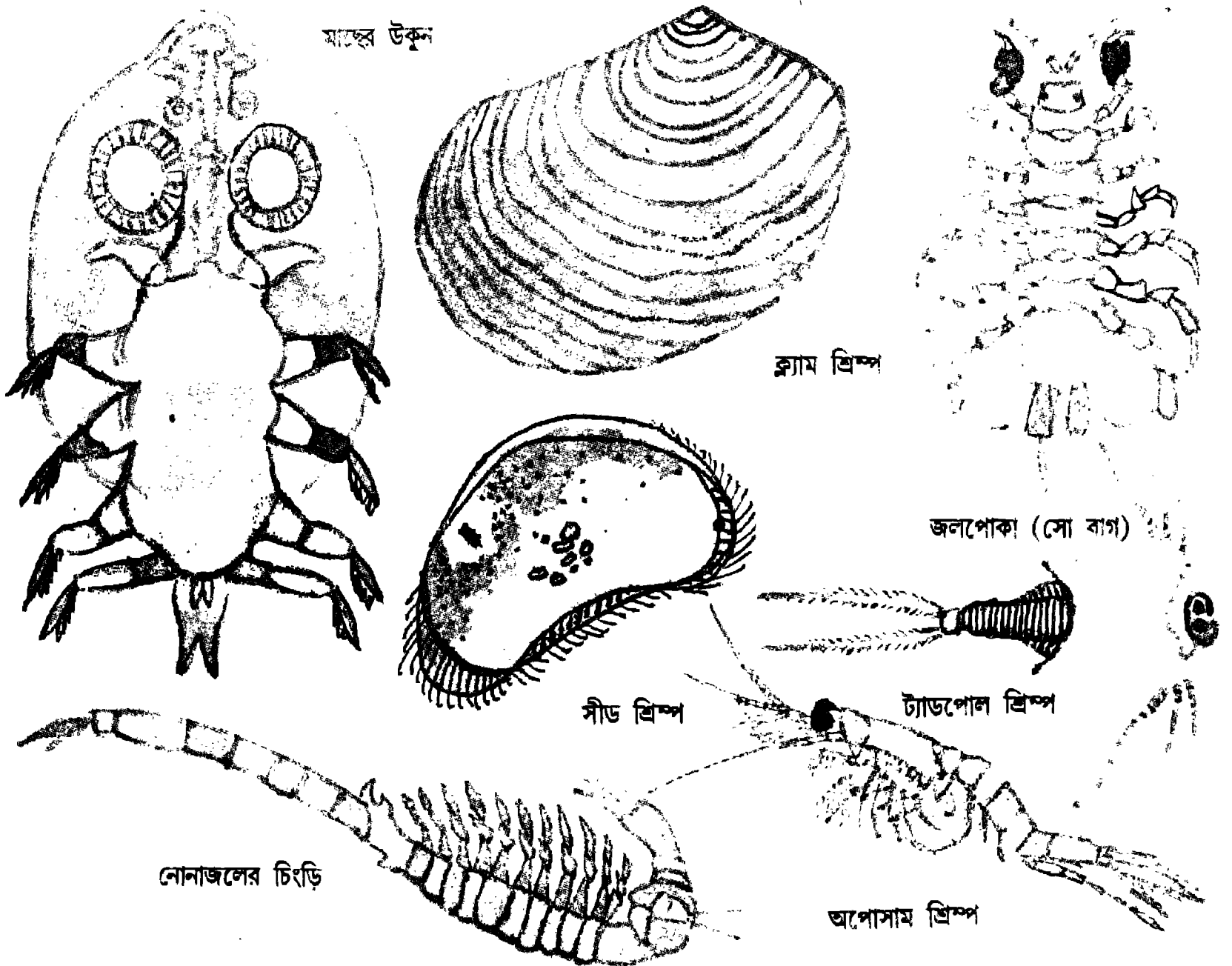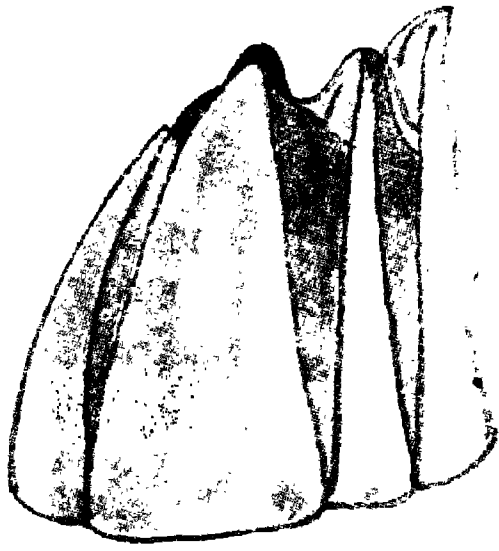
সীড শ্রিম্প (Seed shrimp) আর ক্ল্যাম শ্রিম্প (Clam shrimp) ঝিনুক বা গলদা চিংড়ির মতো দুটি শক্ত খোলার ভেতর বদ্ধ অবস্থায় থাকে। ট্যাডেপোল শ্রিম্পের (Tadpole Shrimp) দেহের একাংশ ঢাকা থাকে চ্যাপটা শক্ত খোলার মধ্যে। এরা দেখতে অনেকটা ছোট মাপের হর্স-শু ক্র্যাবের (Horseshoe Crab) মতো।

ফিশ লাইস (Fish lice) হল মাছের গায়ের উকুন। এদের শরীরের আকৃতি অশ্বক্ষুরের মতো। দৈর্ঘ্যে এরা হয় প্রায় এক সেন্টিমিটার। মাছের শরীরে এরা পরজীবী প্রাণী হিসেবে বাসবাস করে। অপোসাম শ্রিম্পের (Opossum shrimp)পেটের নীচে ডিম রাখবার জন্য ছোট্ট ঝোলার মতো অংশ থাকে। জলচর সো বাগ (Aqhatic sow bug) থাকে সমুদ্রতীরের বালিতে। এদের কিছু কিছু আবার মাছ আর বাগদা চিংড়ির দেহে পরজীবী হিসেবে বাস করে। আইসোপড (Isopod) থাকে বাগদা চিংড়ির কানকোর মধ্যে। আর এদের আশ্রয় দেবার জন্য চিংড়ির খোলস কানকোর ওপর দিয়ে ফুলে ওঠে। এদের দেহ চ্যাপটা (যেন ওপর থেকে নীচের দিকে চাপ দেওয়া হয়েছে)। এ-ধরনের সো বাগ (Sow-bug) আজব জাতের। তরুণ অবস্থাতেই এরা স্ত্রী-পুরুষ জোড় বেঁধে ভেনাসেস ফ্লাওয়ার বাস্কেট (Venus'es flower basket) নামের স্পঞ্জের ফাঁপা দেহের মধ্যে আশ্রয় নেয়। তারপর পূর্ণতা প্রাপ্তির

পর এদের আকার এত বেড়ে যায়, তখন আর স্পঞ্জের ভেতর থেকে তারা বেরোতে পারে না, ফলে সারাজীবন সেখানেই কাটিয়ে দিতে হয়। জাপানীরা তাই সদ্যবিবাহিত দম্পতিকে এক জোড়া সো বাগ সমেত ওই স্পঞ্জ উপহার দেয়, সুখী দাম্পত্য জীবনের স্মারক হিসেবে।

সো বাগের জ্ঞাতি হল সাইড সুইমারস্ (Side Swimmers) বা স্কাডস (Scuds)। দেখতে এরা সো বাড়ের মতোই, কিন্তু দেহ চ্যাপটা (ঠিক মনে হয় দুপাশে কেউ চাপ দিয়েছে)। এরই ফল হিসেবে এরা সোজা হয়ে হাঁটতে পারে না, এক পাশে কাত হয়ে পড়ে যায়। এদের সগোত্র স্কেলিটন শ্রিম্প (Skeleton shrimp) এত ক্ষীণকায় যে দেখলে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বলে মনে হয়। শাখাযুক্ত পলিপ (polype— অপরিণত দেহযন্ত্রযুক্ত সামুদ্রিক প্রাণী) গোষ্ঠীতে বা সামুদ্রিক আগাছার গায়ে এরা ঝুলে থাকে আর ঠিক প্রার্থনার ভঙ্গিতে সামনে পেছনে দোল খায়।

পাথরে বা কংক্রিটের জেটিতে অনেক সময় খুদে আগ্নেয়গিরির আকারের খোলস দেখতে পাওয়া যায়। ওপর দিকে খোলা। এগুলি যখন জোয়ারের সময় জলে ডুবে যায়, তখন নজর করলে চোখে পড়বে যে, এদের ওপরের ঢাকনির মতো অংশটি খুলে যাচ্ছে আর সরু পালক ঢাকা উপাঙ্গ বাইরে বেরিয়ে আসছে এবং আবার ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। এই উপাঙ্গের অধিকারী প্রাণীটি একেবারে শামুকের মতো দেখতে হলেও কিন্তু সন্ধিপদী— নাম অ্যাকর্ন বার্নাকল (Acorn barnacle)। চুণের তৈরি শক্ত খোলসের মধ্যে থাকলেও এরা কিন্তু শামুক নয়, বলা হয়, ক্রাস্টেসিয়ান (Crustaceans)। এরা বেশির ভাগই প্রস্থে মাত্র কয়েক মিলিমিটার আর দৈর্ঘ্যে পাঁচ সেন্টিমিটারের বেশি নয়। কিছু কিছু অ্যার্কন বার্নাকল কচ্ছপের খোলে আর তিমি মাছের গায়েও বাসা বাঁধে।

এদেরই জ্ঞাতিভাই হল গুজ বার্নাকল (Goose barnacle), এদের এই রকম নাম
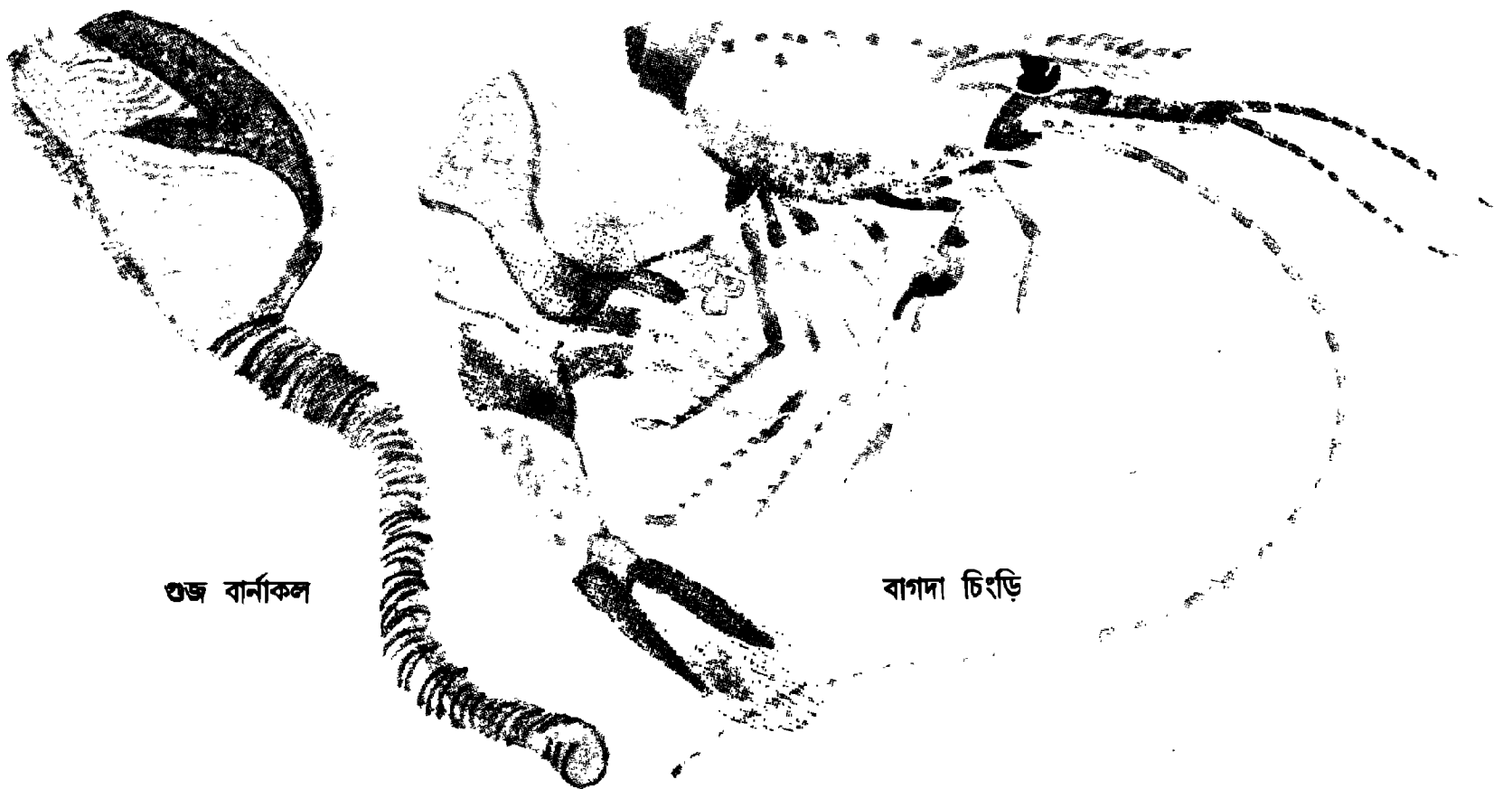
গুজ বার্নাকল

বাগদা চিংড়ি

করণের কারণ হল, মানুষ আগে ভাবত, এই প্রাণীটিই 'জলচর' হাঁসের জন্মদাতা। এদের দেহের এক অংশ বৃন্তের মতো, চামড়ার নলের আকৃতি। উপরিভাগটা হঠাৎ বড় হয়ে চ্যাপটা হয়ে গেছে। এই উপরিভাগের অংশটি কয়েকটি পাতলা চ্যাপটা চুণ-জাতীয় শক্ত খোলসে মোড়া। এরা সাধারণত জলে ভাসমান কাঠের বা গাছের টুকরোকে আশ্রয় করে। তবে আমি এদের সমুদ্রে ভেসে আসা কাচের বোতলে এমন কি রবারের চটিতেও দেখেছি। এদের অনেকে আবার সামুদ্রিক সাপের সঙ্গে সহাবস্থান করে।

অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের ক্রাস্টেসিয়ানরা দশপদী। এদের মধ্যে আছে বাগদা চিংড়ি, গলদা চিংড়ি আর কাঁকড়া (Crab)। প্রত্যেকেই মানুষের সুস্বাদু খাদ্য। বাগদা চিংড়ির নাক প্রলম্বিত, করাতের মতো। তাতে থাকে সাজানো দাঁত চোখ জোড়ার মাঝখানে। পাঁচ জোড়া চলৎক্ষম পা ছাড়াও এদের পেটের নীচের দিকে সাঁতার দেবার জন্য বৈঠার মতো উপাঙ্গ আছে। লম্বা নলের মতো এর উপাঙ্গের ওপর চোখ জোড়া সাজানো। প্রতিটি চোখে আছে বহু সংখ্যক প্রিজমের মতো বস্তু, যা আলাদা আলাদা ভাবে প্রতিবিম্ব প্রস্তুত করতে সমর্থ। সচকিত হলে বাগদা চিংড়ি পিছু হটে বিপদ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। এরা কিন্তু অত্যন্ত সচেতন।

পিস্তল শ্রিম্প (Pistol shrimp) বিশাল দাঁড়ার বুড়ো আঙুলের মতো অংশ বাজিয়ে জোরে শব্দ করতে পারে। অনেক সময় সমুদ্রের তীরে দাঁড়ালে এই শব্দ কানে আসে।

ক্লিনার শ্রিম্প (Cleaner shrimp) হল অসুস্থ মাছেদের ডাক্তার। এরা স্বচ্ছ চেহারার। পাথরের ওপর ডাক্তারখানা সাজিয়ে বসে। যে সব মাছ পরজীবী প্রাণী দ্বারা আক্রান্ত বা যাদের শরীরে কোনো কারণে ক্ষত আছে, তারা চিকিৎসার জন্য এই ক্লিনার শ্রিম্পের কাছে ধর্ণা দেয়। ডাক্তার তখন রোগীর পিঠের ওপর উঠে তাদের পরজীবী প্রাণী, মরা চামড়া ইত্যাদি খেয়ে-দেয়ে রোগের উপশম ঘটায়।

গলদা চিংড়ি দেখতে অনেকটা বাগদা চিংড়ির মতোই তবে আকারে অনেক বড়। এদের রঙের বাহারও বেশি। শরীরের বাইরের খোলস অপেক্ষাকৃত শক্ত চুণ-জাতীয় পদার্থে তৈরি। এদের ডিম বেশ কয়েক সপ্তাহের জন্য বৈঠার মতো উপাঙ্গে আটকানো থাকে অন্তত যতদিন না ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। শিশু গলদা চিংড়ি দেখতে একেবারেই অন্যরকম। এদের দেহ স্বচ্ছ চ্যাপটা পাতার মতো, পা-গুলো অতিমাত্রায় লম্বা। গলদা চিংড়ি সমুদ্রের তলদেশে হেঁটে বেড়াতে পারে, আবার পেটের অংশবিশেষ নাড়িয়ে পিছু হঠে সাঁতারও কাটতে পারে।

কাঁকড়ার পেট খুব ছোট আর তা শরীরের ভেতরে ঢোকানো। সহজেই এদের লিঙ্গ নির্ধারণ করা যায়। কাঁকড়াকে উল্টে দিলে পার্থক্যটি চোখে পড়ে। পুরুষ কাঁকড়ার পেট সরু, ইংরাজী ভি (V) অক্ষরের মতো, কিন্তু স্ত্রী কাঁকড়ার পেট অপেক্ষাকৃতভাবে অনেক চওড়া। কাঁকড়াও ডিম শরীরের নীচে বহন করে। কিন্তু শিশু কাঁকড়া সবদিক থেকেই গলদা চিংড়ির বাচ্চাদের থেকে আলাদা। এদের মাথার আর নাকের ওপর রয়েছে লম্বা শিরদাঁড়ার
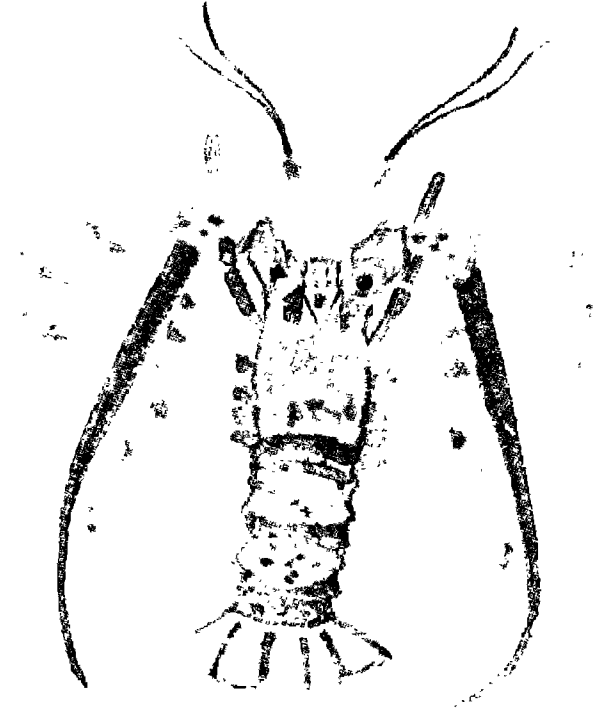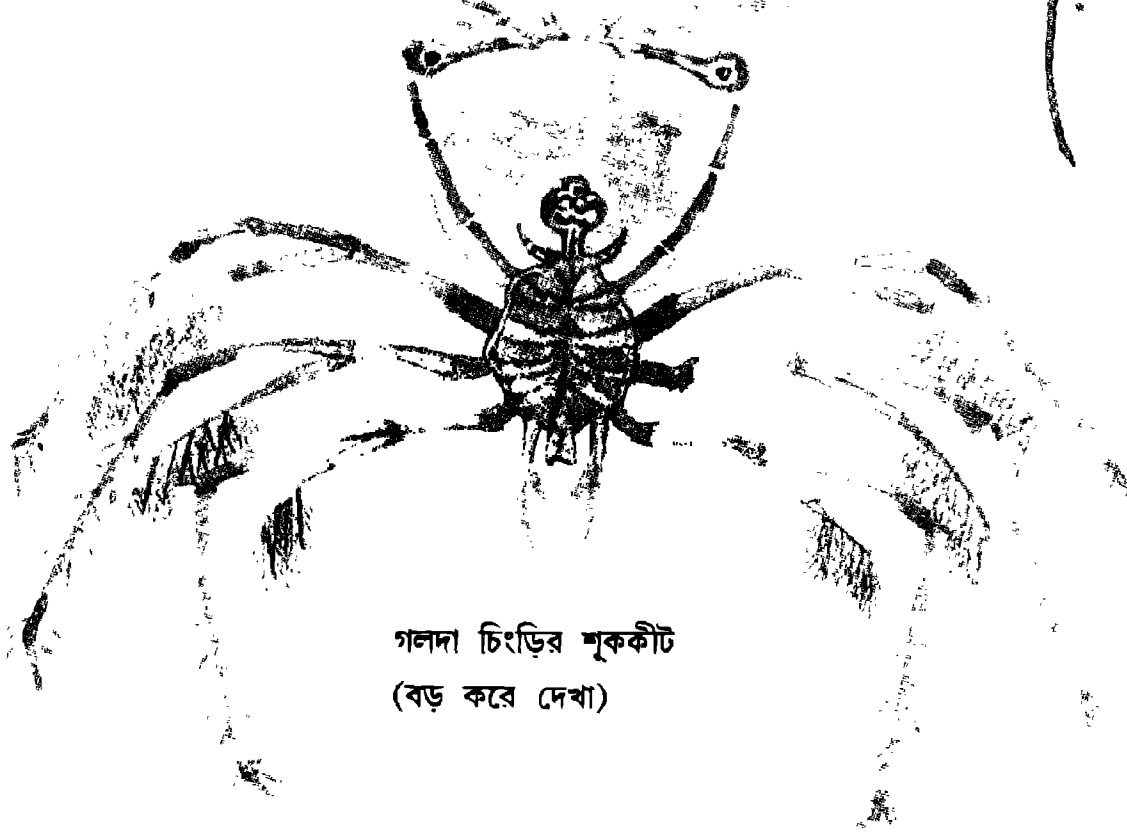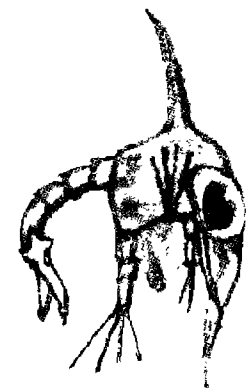
মতো অংশ। **হাঁটুরে কাঁকড়ার** (Working crab) ক্ষেত্রে সব কটি পায়ের ডগা সরু ও সূচালো কিন্তু **সাঁতার কাঁকড়ার** (Swiming crab) ক্ষেত্রে একেবারে শেষের পা জোড়া চ্যাপটা, বৈঠার মতো। তবে সমস্ত কাঁকড়ার ক্ষেত্রেই প্রথম পা জোড়া হল দাঁড়া। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পুরুষ কাঁকড়ার দাঁড়ার মাপ স্ত্রী কাঁকড়ার দাঁড়ার মাপের তুলনায় অনেক বড়।

খৃষ্ট কাঁকড়ার (Christ Crab) শরীরে এমন ভাবে নকশা করা থাকে যে, ঠিক যেন

একটা ক্রুশচিহ্ন আর ক্রুশচিহ্নকে দু-পাশে ডানা মেলে বেষ্টন করে রেখেছে দেবদূতেরা। **মাকড়শা-কাঁকড়ার** (Spider crab) আছে অত্যন্ত লম্বা আকারের পা। এসব পায়ের অনেকগুলোতে আবার শিরদাঁড়ার মতো অংশও আছে। এরা স্পঞ্জ বা সামুদ্রিক আগাছার টুকরো ভেঙে নিয়ে শিরদাঁড়ার ওপর এমন ভাবে আটকে রাখে দেখলেই মনে হয় যেন চলন্ত একটা বাগান। আসলে এই পদ্ধতি হল শত্রুর চোখকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য। অনেকে আবার এজন্য স্পঞ্জের বা ঝিনুকের খোলারও বড় একটা টুকরো পিঠে বয়ে নিয়ে বেড়ায়।

শুঁটি কাঁকড়ারা (Pea crabs) ঝিনুক বা খোলে তরুণ অবস্থায় বাসা বাঁধে আর সারা জীবনই সেখানে কাটিয়ে দেয়। এইভাবে তাদের শত্রুর কবল থেকে মুক্তি মেলে সারাজীবন। ঝিনুক আর চিংড়ির সংগৃহীত খাদ্য এদের খাবারের ভাঁড়ার। কোনো কোনো শুঁটি কাঁকড়ার ক্ষেত্রে দেখা যায়, স্ত্রী সঙ্গীটিই শুধুমাত্র ঝিনুকের ভেতরে থাকে, পুরুষ সঙ্গীটি শুধু বংশবৃদ্ধির প্রয়োজনেই তার কাছে আসে। পুরুষ **ফিডলার কাঁকড়ার** (Fiddler crab) দুটি দাঁড়া। একটি অন্যটির তুলনায় বড়। এরা বালিতে গর্ত খুঁড়ে তার মুখে অপেক্ষা করে। যখন স্ত্রী কাঁকড়া (এরা ছোট দাঁড়া বিশিষ্ট জীব) পাশ দিয়ে যায় পুরুষটি তখন উত্তেজিত হয়ে প্রবলবেগে দাঁড়া নাড়িয়ে স্ত্রী সঙ্গীটিকে মিলনে আহ্বান করে। গর্তটি হল সঙ্গমস্থল। দেখা যায় দুটি পুরুষ কাঁকড়া কখনও বা দ্বন্দ্বযুদ্ধে নেমে পড়ে। দু-জনেই তখন দাঁড়া নাড়িয়ে পরস্পরকে যুদ্ধে আহ্বান করে। অনেকক্ষণ যুদ্ধও হয়, যদি কোনো কারণে পুরুষ তার বড় দাঁড়াটি খুইয়ে ফেলে, তাহলে কিছু দিনের মধ্যেই ছোট দাঁড়াটি বড় হয়ে যায়। আর হারানো দাঁড়ার জায়গায় নতুন ছোট দাঁড়া জন্মায়।

অনেক সময় চোখে পড়ে কাঁকড়ার মূল দেহ আর পেটের মাঝখানের অংশে নরম জেলির মতো জিনিস। এটি হল **ক্রাস্টেসিয়ান পরজীবী** (Crustacean Parasite) যারা কাঁকড়ার শরীরে একাধিক নলের মতো অংশে ছড়িয়ে থাকে। এই পরজীবীর বৈশিষ্ট্য হল, এরা যদি পুরুষ কাঁকড়াকে আক্রমণ করে তাহলে পুরুষটি লিঙ্গ পরিবর্তন করে স্ত্রী কাঁকড়ায় রূপান্তরিত হয়।

আগেই বলেছি, গলদা চিংড়ি আর কাঁকড়ার পুরো শরীর বর্মের মতো খোলসে ঢাকা। **সন্ন্যাসী কাঁকড়া বা হারমিট ক্র্যাবের** (Hermit crab) দেহের সামনের অংশ অত্যন্ত সুরক্ষিত। কিন্তু পেটের অংশটি নরম। ফলে তা অরক্ষিত অবস্থায় থাকে। সেই কারণে, আত্মরক্ষার জন্য সন্ন্যাসী কাঁকড়া শামুকের পরিত্যক্ত খোলসে বাসা বাঁধে আর যেখানেই যায় সেই খোলসটিকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। শামুকের খোলস পাকানো চেহারার হয় বলে সন্ন্যাসী কাঁকড়ার পেটের কাছটাও পাকানো আকার ধারণ করে। যখন শামুকের খোলসের তুলনায় এরা বড় হয়ে যায় তখন খোলস থেকে বেরিয়ে এসে বড় মাপের কোনো খোলসের সন্ধান
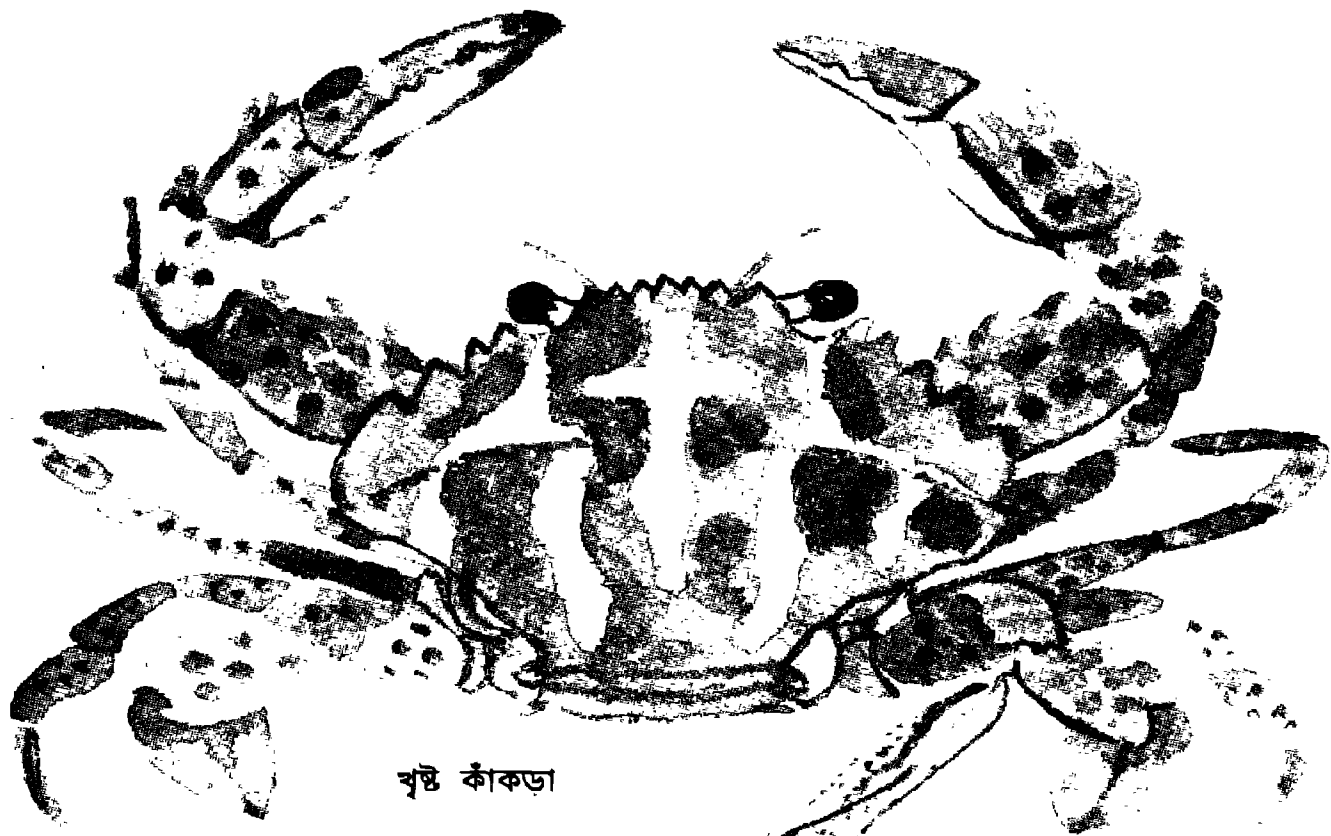
খৃষ্ট কাঁকড়া
যন্ত্রী কাঁকড়া
গুঁটি কাঁকড়া
মাকড়শা কাঁকড়া
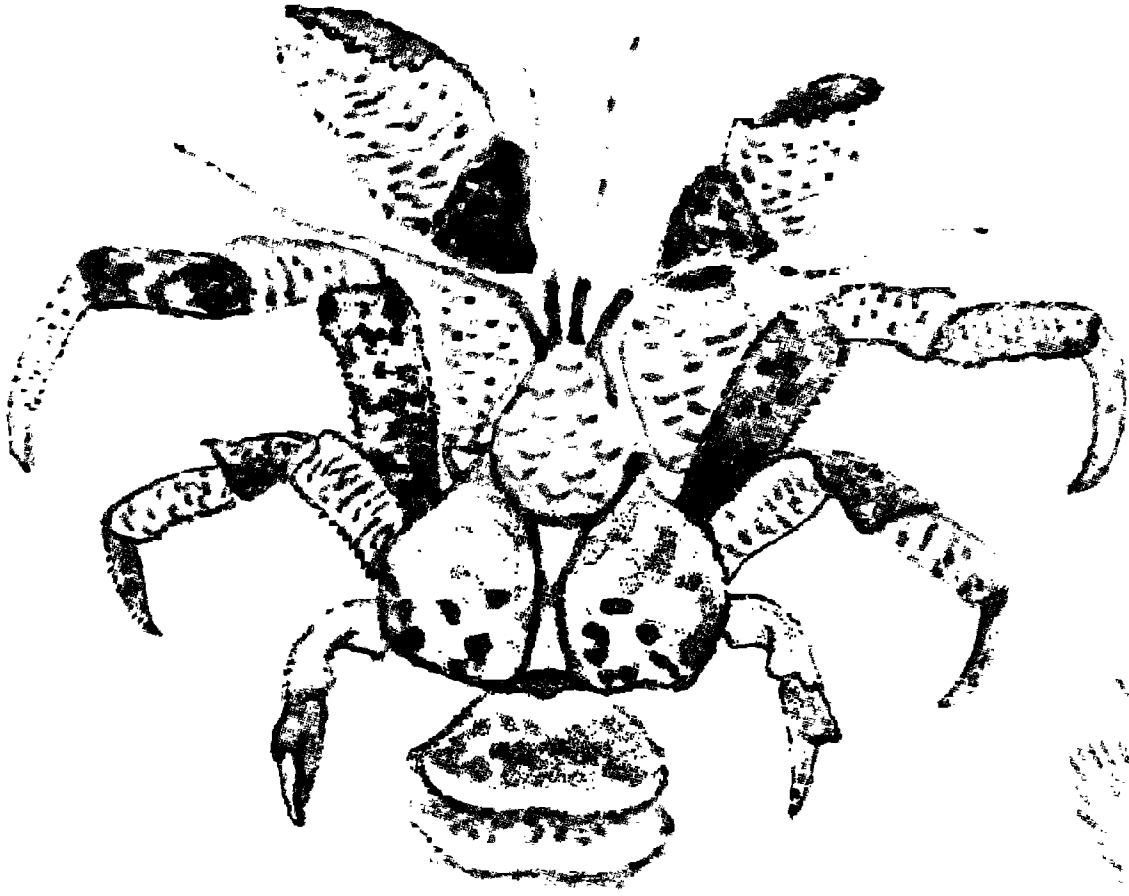
ডাকাত কাঁকড়া
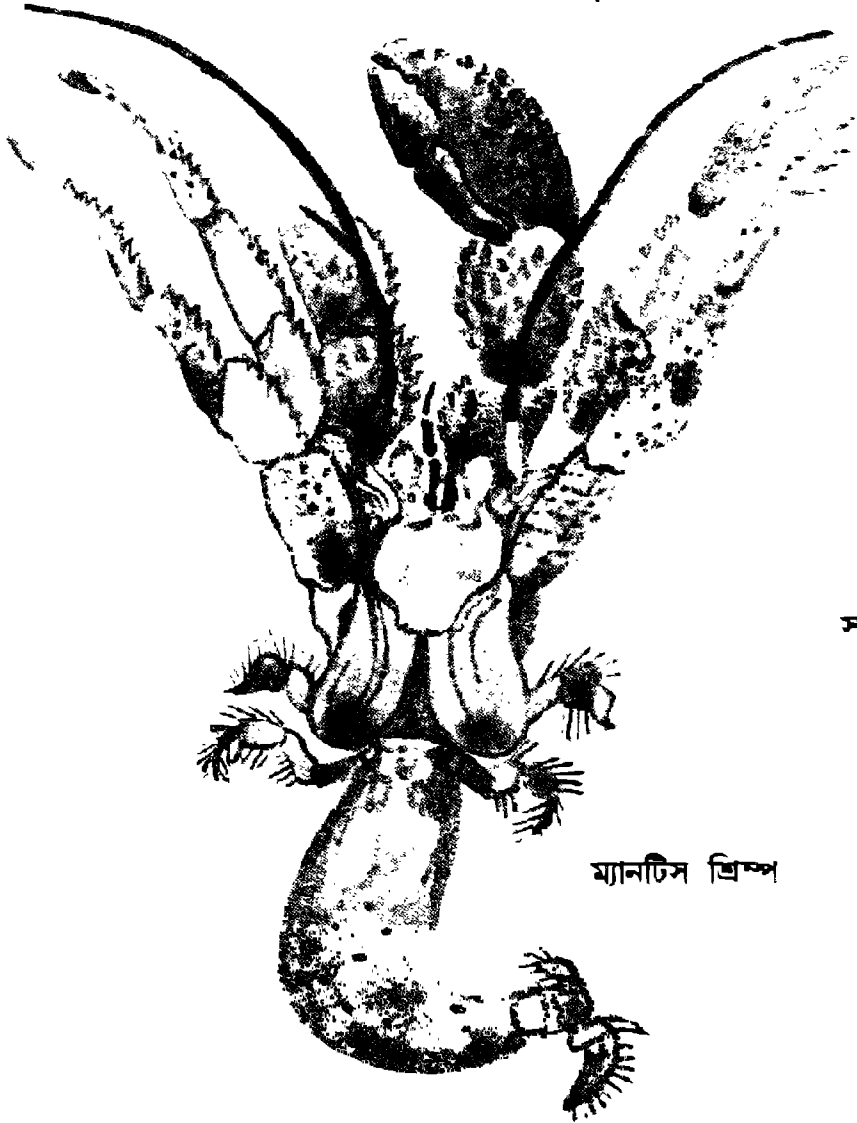
সন্ন্যাসী কাঁকড়া

ম্যানটিস শ্রিম্প
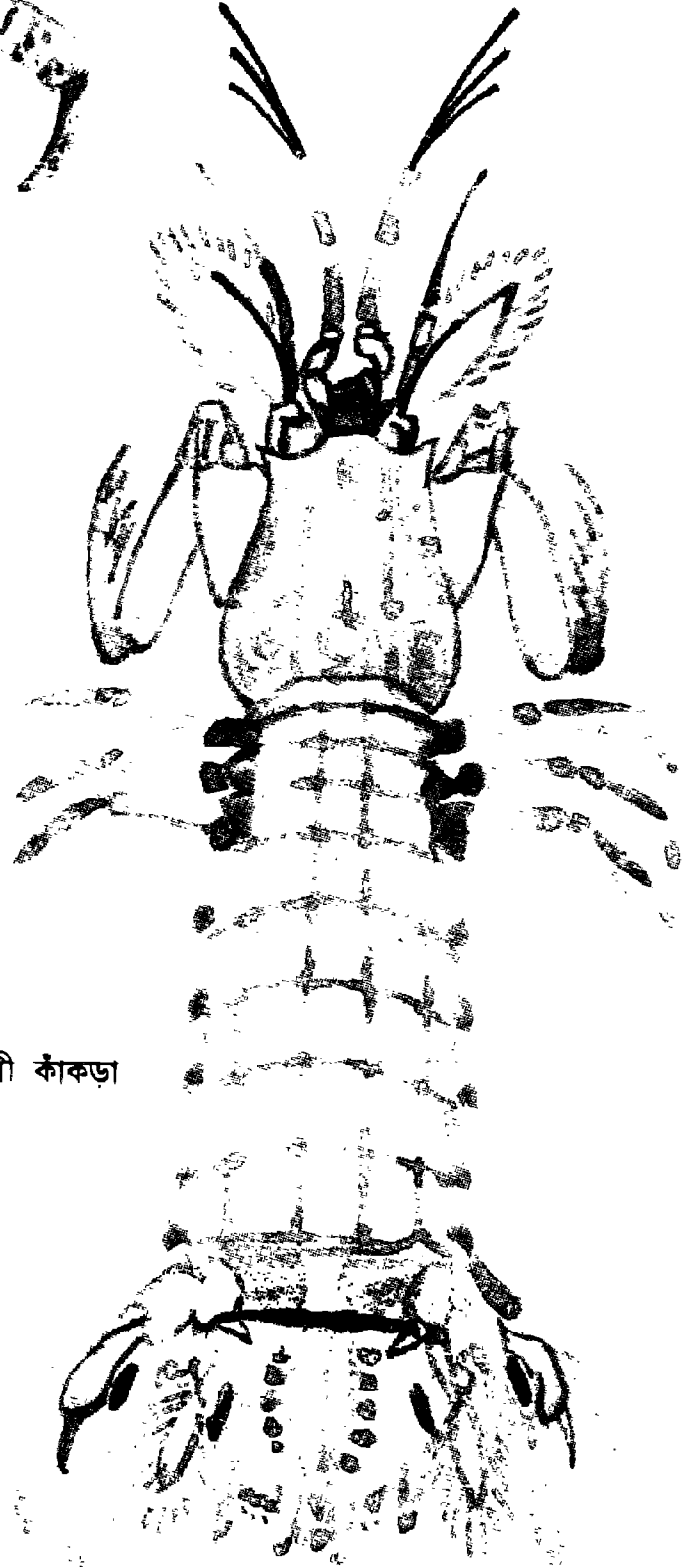
করে। অনেক সময় দেখা যায়, একটি খোলসের মালিকানা নিয়ে দুটি সন্ন্যাসী কাঁকড়া প্রচন্ড লড়াইয়ে মত্ত। অনেকে আবার নিজেদের বাসার ওপর সী-অ্যানিমন সাজিয়ে রাখে। সী-অ্যানিমন শত্রুর কবল থেকে সন্ন্যাসী কাঁকড়াদের রক্ষা করে, পরিবর্তে পায় আহার (যা কিনা সন্ন্যাসীরা সংগ্রহ করে নিজের জন্য)। বিনা পরিশ্রমে চলাফেরার সুবিধা তো রইলই।

ডাকাত কাঁকড়া (Robber crab) হল সন্ন্যাসী কাঁকড়াদেরই দৈত্যাকৃতি জ্ঞাতি। এরা অবশ্য বেশির ভাগ সময়েই স্থলচর। এরা গাছে উঠতে পারে। এমন কি শক্ত দাঁড়ার সাহায্যে নারকেল ভেঙে নিয়ে তার শাঁস খেতে পারে। এদের পেটও যথেষ্ট শক্ত, সুতরাং এদের শামুকের খোলসের ভেতর আশ্রয় নেওয়ার দরকার হয় না। অবশ্য এটা শাপে বর, কারণ ডাকাত কাঁকড়ার আশ্রয় দেওয়ার মতো বড় শামুকের খোল কি আর আছে। এই কাঁকড়া অত্যন্ত দুর্লভ প্রাণী। ভারতবর্ষের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জেই একমাত্র এদের দেখা যায়।

ম্যান্টিস শ্রিম্পের (Mantis shrimp) মাথা আর বুক ছোট মাপের, আর পেট অনেকখানি লম্বা। এদের দাঁড়া শরীরের খুব কাছাকাছি সংলগ্ন থাকে অনেকটা শিকারী ম্যান্টিস বা প্রেয়িং ম্যানটিসের (Praying mantis) মতো, যাতে সহজেই শিকার ধরা যায়। এরা সমুদ্রে অত্যন্ত সুলভ, বাগদা চিংড়ির মতোই, কিন্তু এত ছোট আকারের আর মোটা খোলসের যে এদের খাদ্য হিসেবে মানুষ গ্রহণ করেনি।

অশ্বখুর কাঁকড়া (Horseshoe crab) কিন্তু কাঁকড়া নয়। এরা এক ধরনের মাকড়সা। এদের নামের উৎস হল, দেহের ওপরকার খোলসের বা পাতের মতো অংশের গঠন থেকে। এই পাতটি দেহ আর পা ঢেকে রাখে, বাইরে থাকে শুধু গজালের মতো লম্বা লেজ, এদের দৈর্ঘ্য 60 সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়। বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী কিছু কিছু অঞ্চলে এদের বাসা।

সামুদ্রিক মাকড়সাদের (Sea spiders) দেহ অত্যন্ত ছোট, কিন্তু এদের পা দীর্ঘ। দেহের মাপ এত ছোট যে যকৃত আর পেটের কিছু অংশ পায়ের ভেতর ঢোকানো আছে।

শামুক, ঝিনুক আর কাটল ফিশ

শামুক, ঝিনুক আর কাটল ফিশকে বলা হয় সামুদ্রিক ঝিনুক গোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য সদস্য। অবশ্য বহু শামুক ও কিছু কিছু ঝিনুক স্থলেও পাওয়া যায়। এদের খোলস সাধারণত কুন্ডলী পাকানো বা দুটি সামান্য অবতল অংশের সমষ্টি হিসেবে দেখা যায়। এই অবতল অংশ দুটিকে বলা হয় ভালভ (Valve)। ভালভ দুটি জোড়া লাগানো থাকে। কখনও কখনও খোলস দেহের এক অংশের মধ্যে ঢুকে থাকে। তবে খোলস বিহীন শামুক বা ঝিনুক বলতে গেলে দেখাই যায় না।
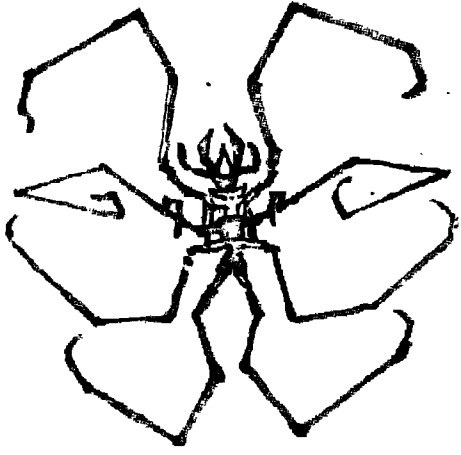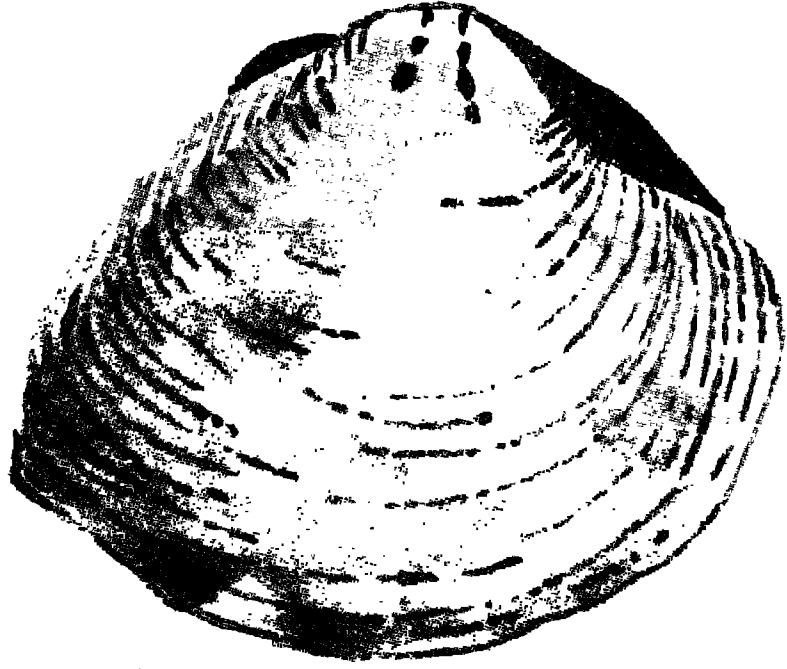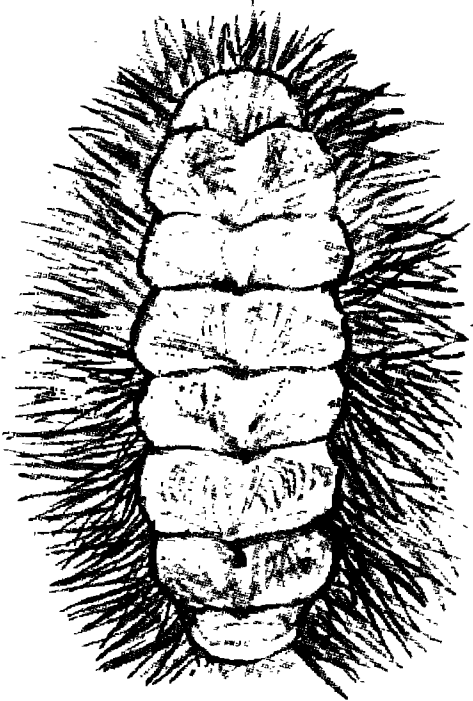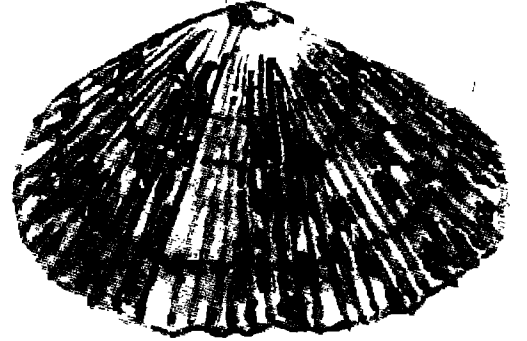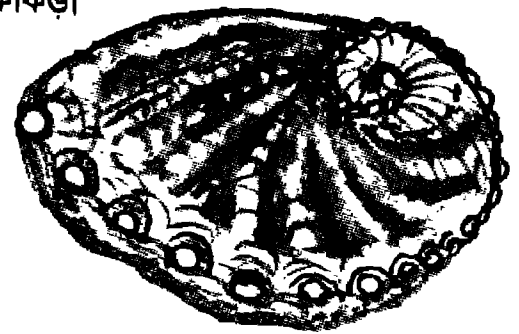
এই দলের সবচেয়ে প্রাচীন সদস্য হল কোট-অব মেইল (Coat-of-mail) এদের নরম শরীরের বেশির ভাগ অংশ আটটি আলাদা আলাদা পাতের মতো খোলসে ঢাকা।

হাতি দাঁত ঝিনুক (Elephant's task sell) দেখতে ঠিক হাতির দাঁতেরই মতো। এটির দৈর্ঘ্য মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার। নলাকৃতি খোলসটি সামান্য বাঁকানো আর এক প্রান্ত অন্য প্রান্তের তুলনায় চওড়া।

স্থানু ঝিনুক (Limpel shell) চ্যাপটা শঙ্কু আকৃতির। প্রাণীটি মসৃণ সমতল পাথরের ওপর দিনের বেলা বসে থাকে। রাতে সামান্য কয়েক মিটার মাত্র নড়াচড়া করে, শৈবাল সংগ্রহ করে, খাদ্য হিসেবে। আবার সূর্যোদয়ের আগেই ফিরে আসে পুরনো জায়গায়। একই ভাবে একই জায়গায় থাকতে থাকতে দেখা যায়, পাথরের ওপর ওই নির্দিষ্ট জায়গায় একটা অগভীর গর্ত হয়ে গেছে।

শামুকের খোল হল কুন্ডলী পাকানো। খোলের ভেতর এদের নরম দেহ সুরক্ষিত অবস্থায় থাকে। জিভের মতো আকারের আঠালো রস মাখা পায়ের সাহায্যে এরা হামাগুড়ি দিয়ে বেড়ায়। শামুকের জিভ ফিতের মতো, তাতে অসংখ্য ছোট ছোট দাঁত সাজানো থাকে, ঠিক যেন মিস্ত্রীর করাত। এই দাঁতের সাহায্যে এরা খাদ্য সংগ্রহ করে, দরকার হলে গর্তও খোঁড়ে। অনেক শামুকের পায়ে শক্ত চুণ-জাতীয় পদার্থে তৈরি পাতের মতো অংশ থাকে। নরম দেহের এই প্রাণীটি খোলসের ভেতর ঢুকলে এই পাত ঢাকনির মতো খোলসের মুখ বন্ধ করে দেয়। আমাদের দেশে শত-সহস্র রকমের শামুক আছে। আমরা অবশ্য অল্প কয়েকটি বিশেষ প্রজাতির কথাই এখানে আলোচনা করব। সামুদ্রিক ঝিনুক, শামুক ইত্যাদির আকার ও বর্ণবৈচিত্র্যের জন্য বহু লোক এগুলো সংগ্রহ করে। কিছু কিছু ঝিনুক ও শামুক তো অত্যন্ত চড়া দামে বিক্রীও হয়।

কর্ণ ঝিনুক (Ear shell) বা অ্যাবালোন (Abalone) নামের দিক থেকে খুবই উপযোগী। এরা ঠিক মানুষের কানের মতো দেখতে, আর তাদের ধার ঘেঁষে পরপর ছোট ছোট ছিদ্র থাকে। স্থানুদের মতো এরাও পাথরের গায়ে শক্ত হয়ে আটকে থাকে।

ছোট্ট ছোট্ট **বোতাম ঝিনুক** (Button shell) দেখতে সুন্দর এরা নানা রঙের হয়। যেমন, গোলাপী, বাদামী, ধূসর ঘেঁষা নীল, সাদা ইত্যাদি। আকারে শার্টের বোতামের মতোই। অগুনতি বাটন শেল সমুদ্রের তীরে বালির ওপর পড়ে থাকতে দেখা যায়।

হরিৎ ঝিনুক (Periwinkles) প্রচুর পরিমাণে সমুদ্রের জল না পেলেও বেশ কিছুদিন দিব্যি কাটিয়ে দিতে পারে। এরা থাকে সরু শঙ্কুর আকারের খোলসের মধ্যে। বেশ উচ্চতায় পাথরের গায়ে এরা আটকে থাকে। সমুদ্রের জল হয়তো সেই পাথরের গায়ে সব সময় পৌঁছয়ও না—ঢেউ তীরে আছড়ে পড়ার সময় যেটুকু জলের ঝাপটা আসে, তাতেই এরা বেঁচে থাকে।

কড়ি (Cowrie) সংগ্রাহকদের অতি প্রিয়। এদের ডিম্বাকৃতি খোল বাইরে থেকে দেখলে বোঝাই যায় না যে তাতে কুন্ডলী আছে কিনা। একমাত্র খোলটিকে কাটলে দেখা যায়
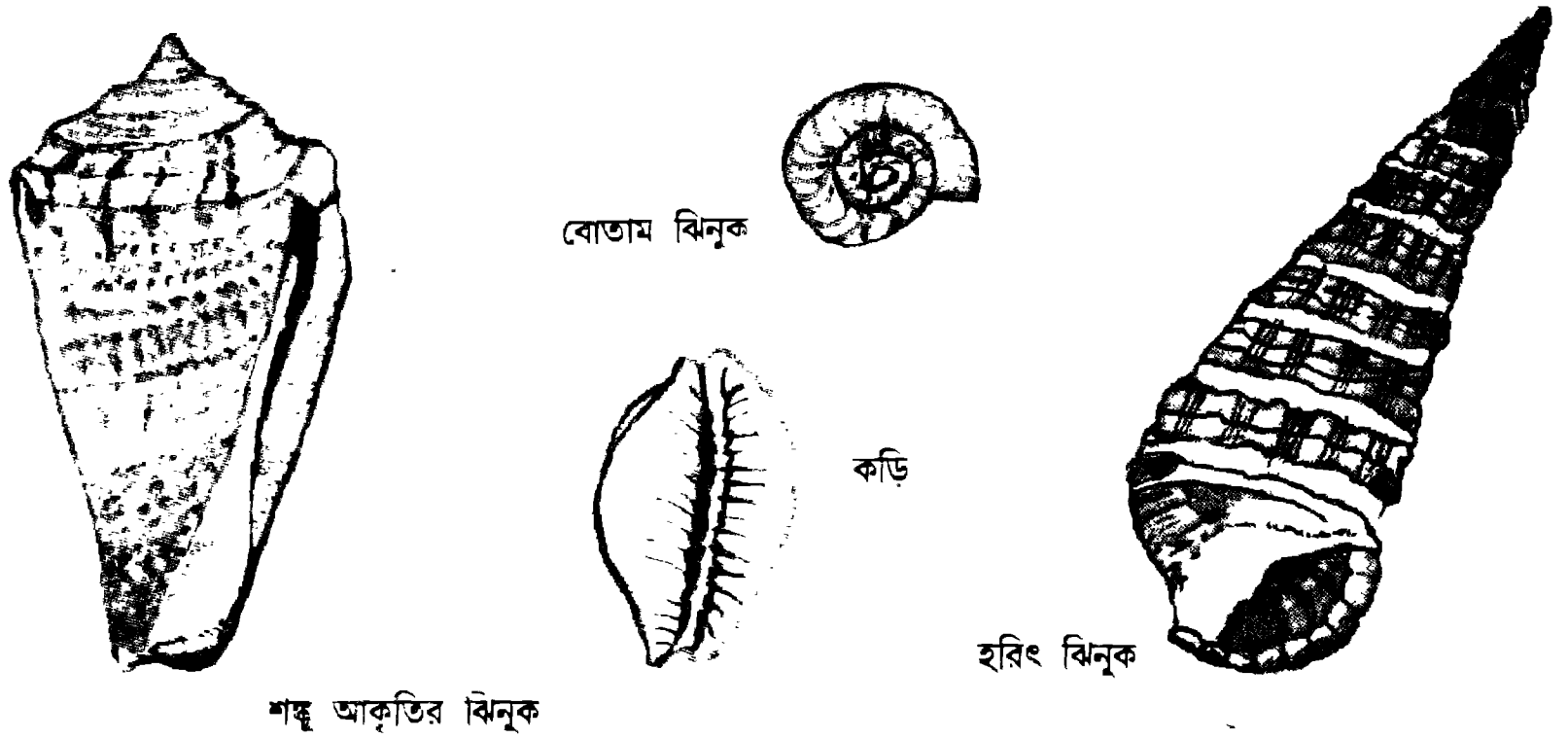
কুন্ডলীটি ভেতরের দিকে। খোলের নীচের দিকের সরু কাটা অংশ থেকে প্রাণীটির পা বাইরে বেরিয়ে আসে—যার পাতলা মাংসল অংশটি খোলের বেশ খানিকটা অংশ ঢেকে রাখে, ফলে খোলটি হয় মসৃণ ও চকচকে। কড়িরই ছোট ভাই যারা, অর্থাৎ আকারে ছোট, তারা বেঁচে থাকে সাগর-পালকের ওপর নির্ভর করে। এরা দেখতেও একেবারে সাগর ফলকের মতোই, খুব ভালো করে নজর না করলে তফাত ধরাই পড়ে না।

শঙ্কু (Cones) প্রজাতির খোল লম্বাটে, চকচকে ও মসৃণ। এদের খোলের ওপরের অংশ পেঁচানো কিন্তু চ্যাপটা আকারের। হাতে নিয়ে দেখতে গেলে যথেষ্ট সাবধানতা দরকার। এদের জিভের আগায় আছে ছোট ছোট তীরের ফলার মতো অংশ, অত্যন্ত বিষাক্ত। এগুলি শিকার ধরার জন্য ব্যবহৃত হয়। কখনও কখনও এই বিষ এতই তীব্র, তাতে মানুষও মারা যেতে পারে।

শঙ্খ (Sacred chank) সাদামাটা চেহারার, সাদা রঙের। যা পূজার কাজে লাগে। এ থেকে শাঁখাও তৈরী হয়। এদের ডিম্ব খোলক (Egg-case) দেখতে অনেকটা রামছাগলের শিঙের মতো। তাতে গোটা পঁচিশ ছোট ছোট ছিদ্রযুক্ত প্রকোষ্ঠ থাকে। যার ভেতর দিয়ে জল ঢুকতে পারে। শিশু অবস্থায় এরা পরস্পরকে ভক্ষণ করে, ফলে একটি ডিম্বখোলক থেকে মাত্র কয়েকশ পূর্ণাঙ্গ প্রাণীই বেরিয়ে আসতে পারে।

হেলমেট শেল (Helmet shell) অত্যন্ত ভারী, বড়গুলির ওজন এক কিলোগ্রাম পর্যন্ত
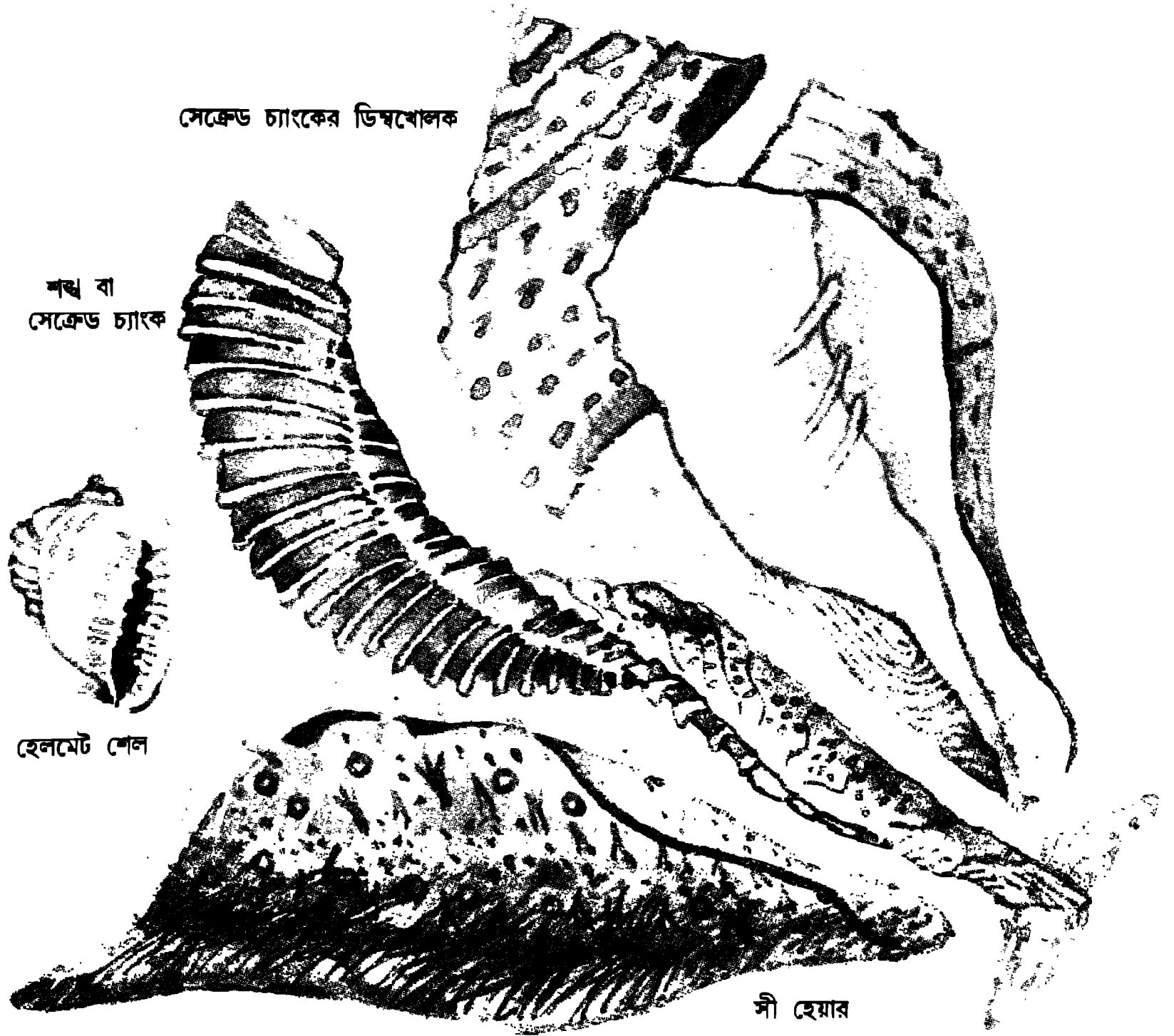
হয়। হেলমেট শেল, কড়ি আর উইং শেল (Wing shell) নকশার কাজে লাগে। মণিকাররাও ব্যবহার করে।

সী হেয়ার (Sea hare) সামুদ্রিক আগাছায়-ভরা পাথরে দেখতে পাওয়া যায়। এদের শরীর নরম। দেখতে গাঢ় সবুজ। মাথায় দু-জোড়া কর্ষিকা। অপেক্ষাকৃত লম্বা কর্ষিকা জোড়া, দেখতে খরগোসের কানের মতো। ভেতরে নরম, স্বচ্ছ কাচের মতো খোলের সন্ধান মেলে,

সী স্লাগ

তবে তা ব্যবচ্ছেদের পর। আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষার জন্য এরা লালচে বেগুনী রঙের তরল জিনিস বার করে। এদের ডিম হলুদ। সুতোর মতো অংশে পরপর সাজানো থাকে, আর ডিমের গুচ্ছকে দেখলে মনে হয় যেন জট পাকানো সুতোর গুলি।

জলচর শামুক (Sea slug) রঙ দেখতে সুন্দর। এদের স্থলচর জাতভাই অবশ্য দেখতে খুবই বিচ্ছিরি। এদের কোনোটার আকার চ্যাপটা চাকতির মতো। পেছনের দিকে একটি ফুটো আছে, যার ভেতর একগুচ্ছ পালকের মতো কানকো, এই কানকোই সী স্লাগের শ্বাসযন্ত্র। একটি সী স্লাগকে জলে দিলে দেখা যায় পালকের মতো কানকোর গুচ্ছ ঠিক যেন ফুলের পাপড়ির মতো নিজেদের মেলে ধরেছে। অন্য ধরনের সী স্লাগের দেহ লম্বা, এক প্রান্ত সরু হয়ে এসেছে। এদের পিঠের ওপর খুব সুন্দর চুল বা সরু আঙুলের মতো উপাঙ্গ দেখা যায়।

এ-ধরনের শামুকের খাবার হল স্পঞ্জ, সী ফ্যান, কোরাল আর পলিপস। ভক্ষ্য বস্তুর বিষাক্ত কোষ এদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না, উপরন্তু বিষাক্ত কোষগুলোকেও এরা দিব্যি খেয়ে নেয়। যখন সী স্লাগকে অন্য কোনো প্রাণী আক্রমণ করে। তখন এই বিষাক্ত কোষগুলোর সাহায্যে এরা আত্মরক্ষা করে।

সামুদ্রিক ঝিনুক ও শামুক গোষ্ঠীর দ্বিতীয় বৃহত্তম শাখার খোলটি দুটি অংশে ভাগ করা যায় (এরা একসঙ্গে কব্জা লাগানোর মতো জোড়া থাকে) এবং এদের মধ্যে প্যাঁচালো

অয়েস্টার বা ঝিনুক
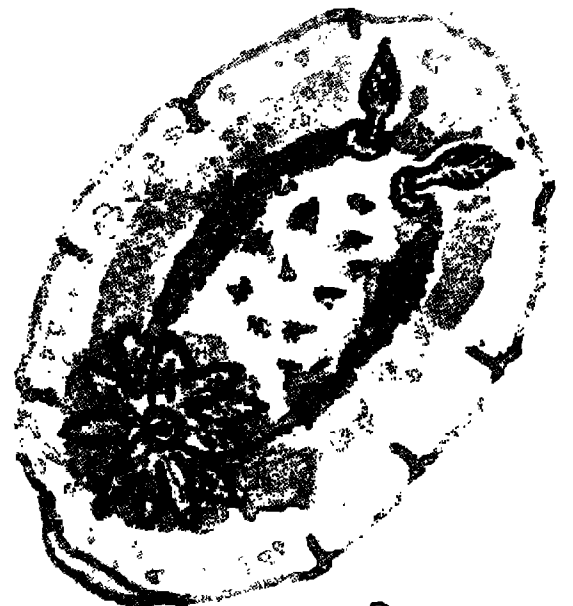
সী স্লাগ

অংশ দেখা যায় না। এদের শরীরে সাইফনের মতো নল থাকে। যার সাহায্যে জল সংগ্রহ করে কানকোয় পাঠায়। এই জলে ভাসমান অবস্থায় ছোট ছোট খাদ্য কণা সংগ্রহ করে। জল নিকাশী নলটিও সাইফনের মতো। এই সব ঝিনুকের ভেতরের নরম শাঁস কিন্তু সামুদ্রিক সুখাদ্য। অবশ্য যে-সব ঝিনুক দূষিত জলে থাকে, তা না খাওয়াই উচিত। কারণ এই সব ঝিনুক টাইফয়েড ও অন্যান্য আন্ত্রিক রোগের জীবাণু বহন করে।

এরা সব সময়ই পাথরের গায়ে নিজেদের আটকে রাখে। এদের দুটি খোলের মধ্যে বড়টি আটকানো থাকে। প্রাণীটি এক ধরনের সিমেন্ট জাতীয় জিনিস উৎপাদন করে। আর ছোটটি থাকে বড়টির ওপর। উইন্ডো-পেন ঝিনুক বা অয়েস্টার (Window-pane-oyster) কাদায় ডুবে থাকে। এদের খোল পাতলা। বেশ চ্যাপটা আর চওড়ায় প্রায় 15 সেন্টিমিটার পাতের মতো। এগুলি ঝাপসা ধরনের। আগে জানলার ঘষা কাচের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ঝিনুকের মতোই ছোট ছোট কাঁকড়ার (Pea crab) খোলের ভেতর থাকে।

মাসেলের (Mussel) খোল লম্বা আকারের। বাদামী বা গাঢ় সবুজ রঙের। এরাও পাথরে সংলগ্ন অবস্থায় বসবাস করে। তবে স্থায়ীভাবে নয়। এদের শরীর থেকে আঠালো সুতোর মতো পদার্থ বার হয়। তারই সাহায্যে এরা আটকে থাকে, তবে দরকার মতো সুতোর বাঁধন ছিঁড়ে এদিক ওদিক চলাফেরাও করে। মাসেল গোষ্ঠীবদ্ধ জীব। এরা ঝাঁক বেঁধে বাস করে। (মাসেল এক ধরনের ঝিনুক।) ক্ষুরের ফলার মতো (রেজার শেল (Ragor shell)-এর খোল দুটি লম্বা আকারের ঠিক নাপিতের ক্ষুরের মতো। এরা পেশীযুক্ত পায়ের সাহায্যে চট্ করে বালিতে গর্ত খুঁড়তে পারে।
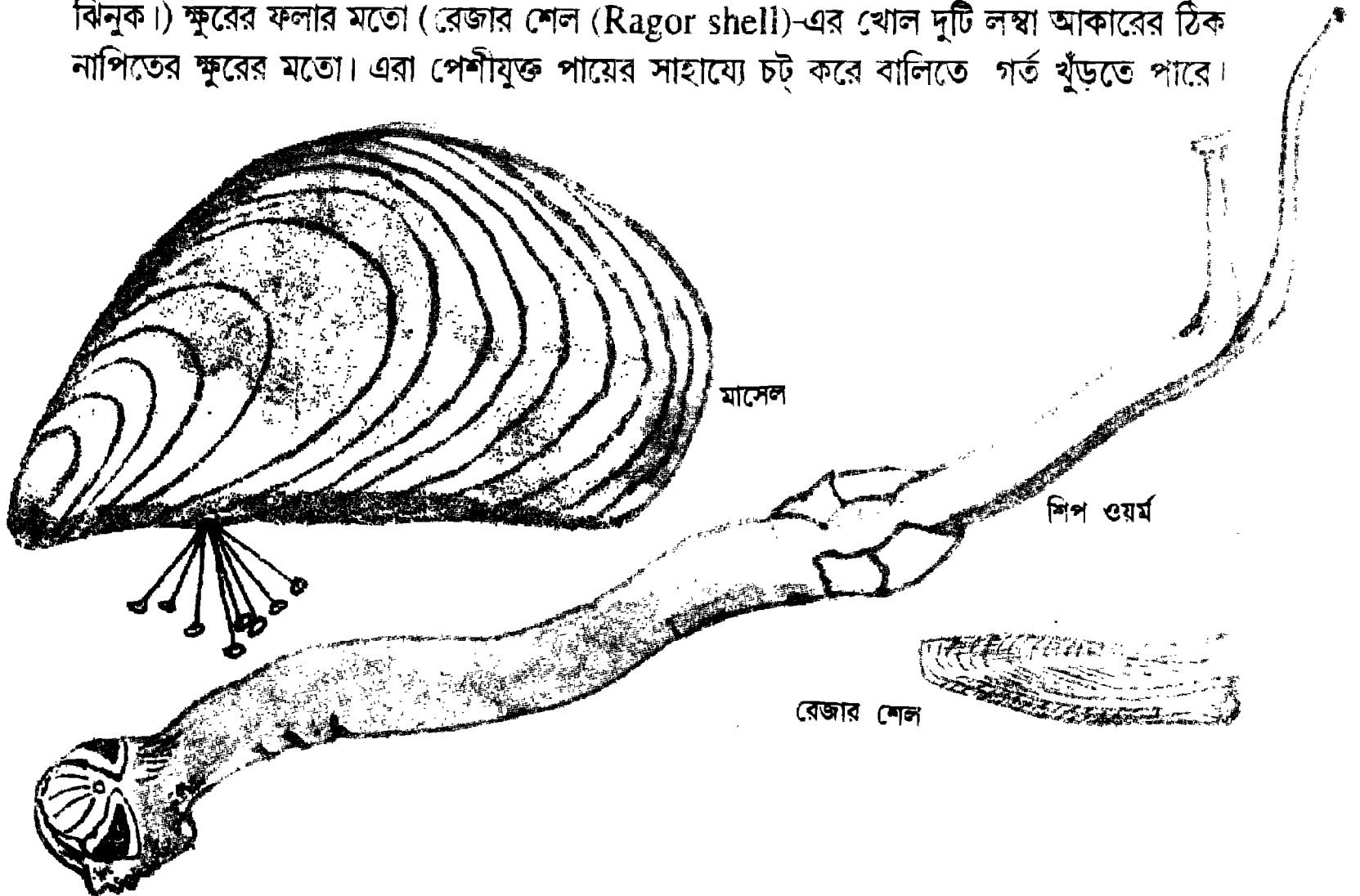
প্রথম দর্শনে শিপ ওয়র্ম (Ship worm)-কে কোনোভাবেই ঝিনুক গোষ্ঠীর বলে মনে হয় না। এরা কাঠ ফুটো করে সেই গর্তে চুণজাতীয় পদার্থের নল বানিয়ে বাস করে। নলটি ভেঙে ফেললে ভেতরে লম্বা পেন্সিলের মতো নরমদেহী প্রাণীটির সন্ধান মেলে। এই সুড়ঙ্গের মুখে খুব ছোট একটি ছেঁদা থাকে। প্রাণী দেহের এক প্রান্তে আছে দুটি খুব ছোট ভালভের মতো অঙ্গ যা থেকে বুঝতে পারা যায় এটি ওয়র্ম নয়। এই প্রাণীটি কিন্তু সমুদ্রে জাহাজ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত কাঠের পাটাতন বা নানা রকম কাঠের জলযানের ক্ষতি করে।

স্কুইড (Squids) **আর কাটল ফিশ** (Cuttle fish) : শামুক বা ঝিনুকের মতো দেখতে না হলেও এদেরই শাখা। এরা খুবই চটপটে আর বুদ্ধিও ধরে প্রচুর। এদের শরীরে ঢালের মতো—অবশ্য কাটল ফিশের ক্ষেত্রে ঢালের অংশ বেশি চওড়া, স্কুইডের ক্ষেত্রে এই অংশটি কম চওড়া। মাথার কাছে থাকে আটটি ছোট আর দুটি বড় লম্বা মাংসল শুঁড় বা আঙুলের মতো প্রত্যঙ্গ, তাতে থাকে একাধিক শোষক যন্ত্র (Suckers)। প্রাণীটি শিকারের শরীরে এইগুলো ঠেকিয়ে চাপ দেয়, ফলে শূন্যতার সৃষ্টি হয় আর শিকারও আটকে যায়। আক্রান্ত হলে এদের শরীর থেকে বেরোয় বাদামী কালির মতো তরল জিনিস এতে জলের রঙ ঘোলাটে হয়ে যায়, আর শত্রু ভালো করে হদিশ পাবার আগেই এরা পালিয়ে যায়। সাধারণত এরা সমান্তরালভাবে
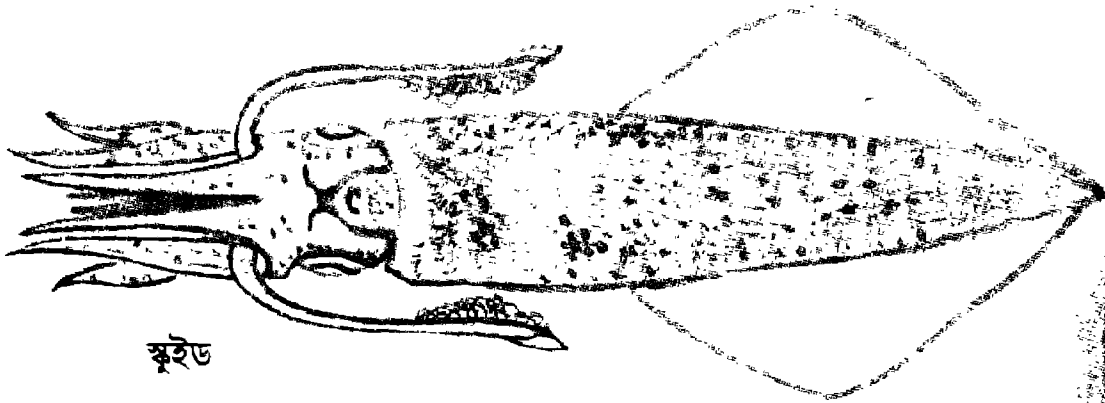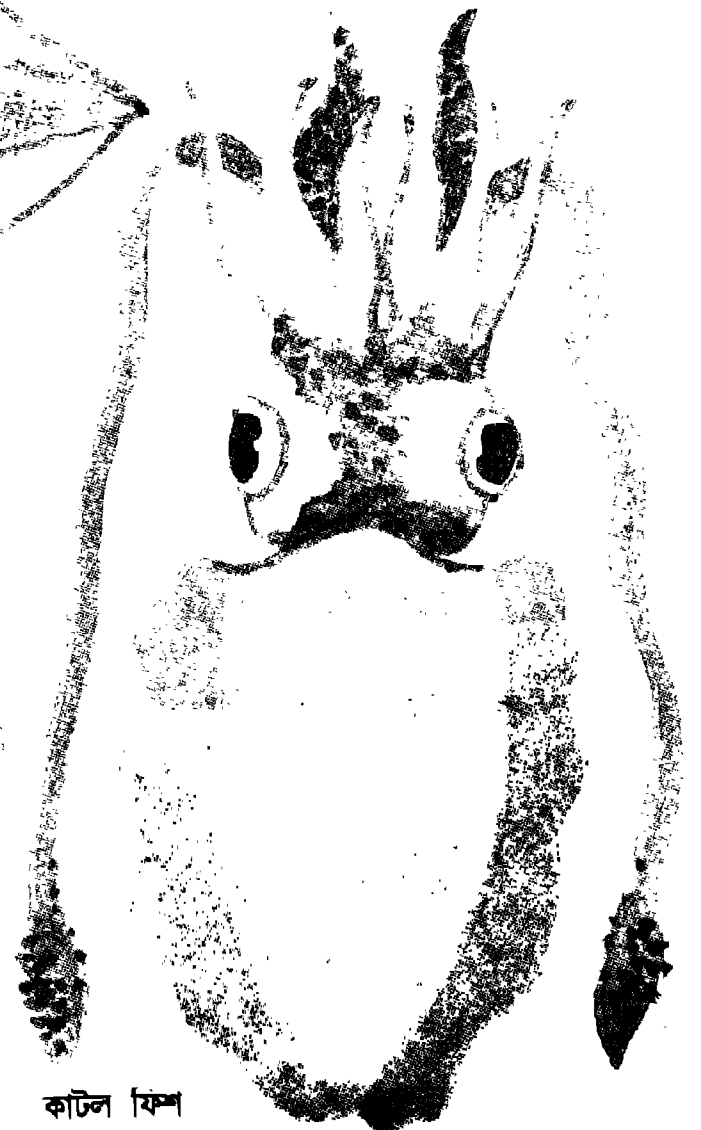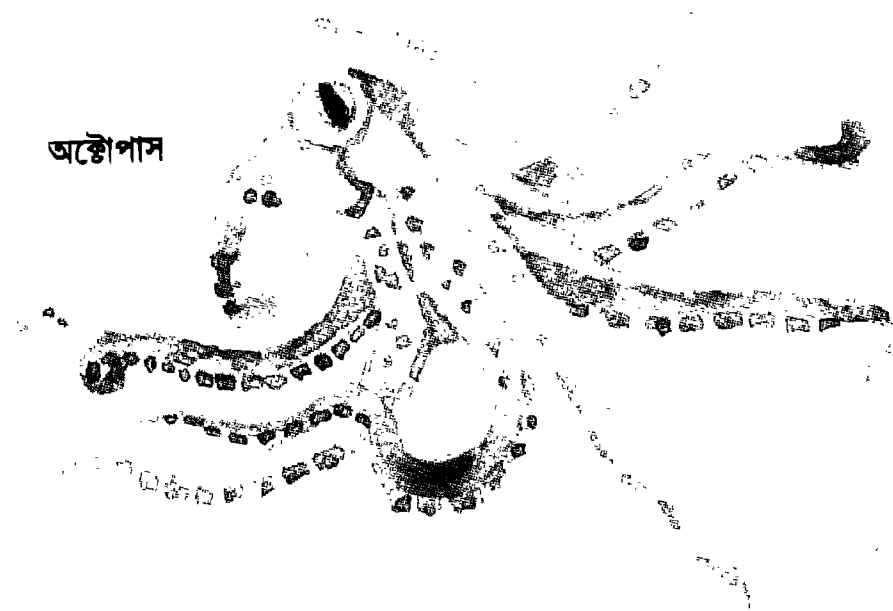
(Horizontally) সাঁতার কাটে, তখন জলে অল্পমাত্রায় ঢেউয়ের সৃষ্টি হয় তবে কখনও কখনও জল কেটে তীব্রভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যেতেও পারে। সামনের দিকে এগোবার সময় এরা পেছনদিকে শরীরের ভেতর একটা নলের মতো শরীরে একটা অংশ থেকে তীরের মতো জল বের করে দেয়, ফলে সেই জলের চাপে অপর দিকে নিজে এগিয়ে যায়। এদের মুখে আছে টিয়াপাখির মতো ঠোঁট। যা দিয়ে খাবার কেটেও খেতে পারে। এদের চোখও উন্নত মানের। দেহের ভেতরে খোলটি লুকানো থাকে। খোল খুব পাতলা, স্বচ্ছ, একে পেন (Pen) বলা হয়। কাটল ফিশের খোল তৈরি চুণ-জাতীয় জিনিসে। বেশ শক্ত তবে হালকা আর ফাঁপা। এই খোল পাখির খাবার হিসাবে ব্যবহার হয়। (ক্যালসিয়াম হিসেবে) এরকম খাবারেই পাখির ডিমের খোলস শক্ত হয়।

অক্টোপাসের (Octopus) আটটি পা। শরীর গোলাকার। এদের দেহে খোল নেই। এরাও কালির মতো তরল নিঃসরণে সমর্থ। অক্টোপাস সাধারণত এক জায়গাতেই থাকতে পছন্দ করে। যদি কখনও ভাঙা কাঁকড়ার খোলের স্তূপ নজরে পাড়ে, বুঝতে হবে কাছাকাছি অক্টোপাসের আস্তানা আছে। মা অক্টোপাস আঙুরের আকারের ছোট গোল গোল ডিম পাড়ে; এগুলো সাজানো থাকে মালার আকারে। ডিম পাড়বার উপযুক্ত স্থান হল পাথরের নীচে। ওই ডিম ফুটে বাচ্চা বের না হওয়া পর্যন্ত মা অক্টোপাস পাহারা দেয়, এমন কি খেতেও যায় না। কিন্তু শিশু অক্টোপাস জন্মাবার পরই মা মারা যায়।
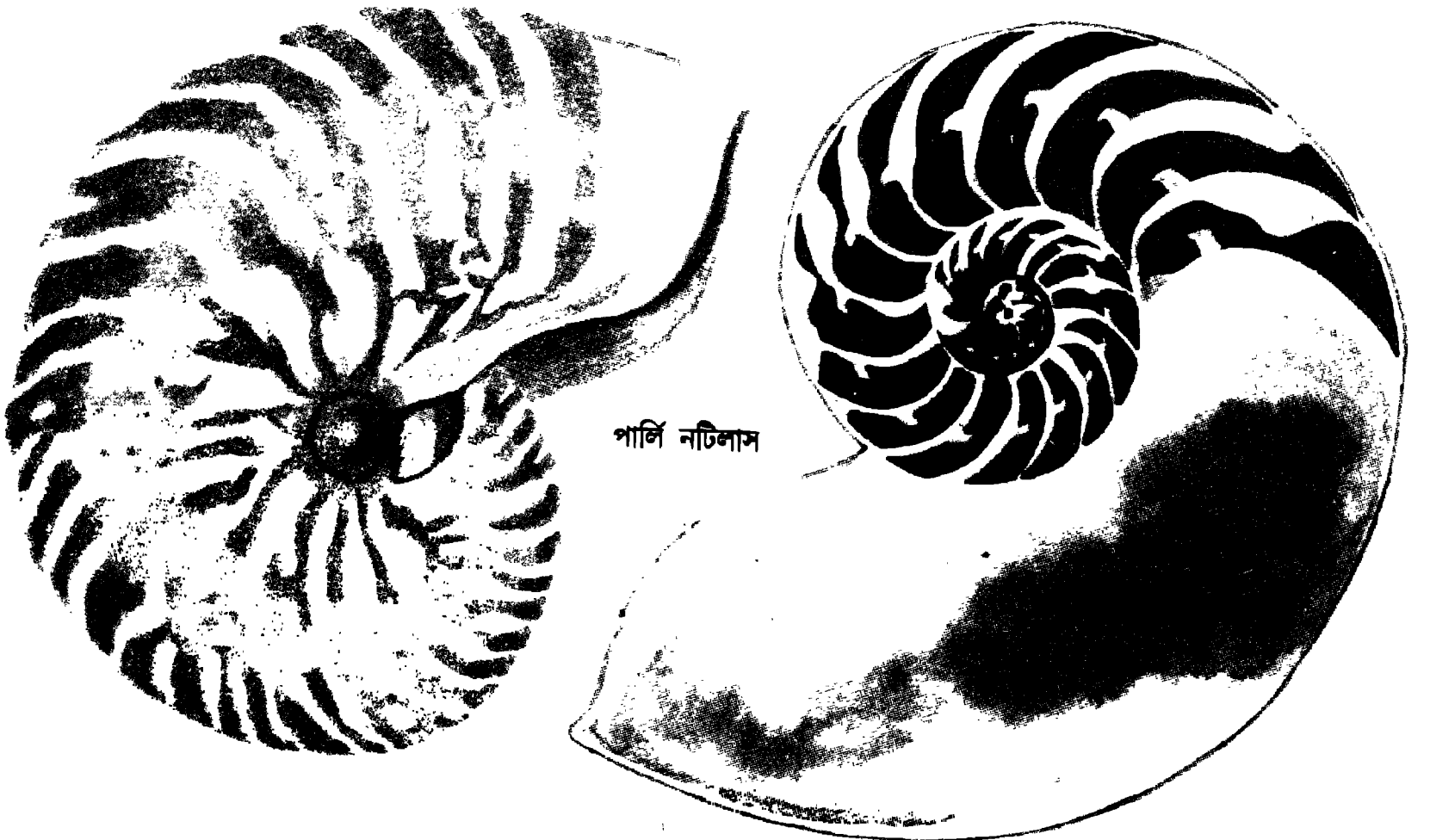
পার্লি নটিলাস

নটিলাসের কাটা খোল

এক নজরে **পার্লি নটিলাসের** (Perly Nautilus) খোল দেখলে সাধারণ শামুকের খোল বলে ভুল হবে। কিন্তু এই খোলের ভেতরের প্রাণীটি অক্টোপাসের আকারের, আপাতদৃষ্টিতে খোলটি যে খুব সুন্দর দেখতে তা কিন্তু নয়, রঙ-আকার দুই-ই সাধারণ। শুধু খোলের গায়ে আগুনের শিখার মতো বাদামী রঙা নকশা কাটা থাকে। এই খোলের সবচেয়ে বাইরের স্তরটি অ্যাসিড দিয়ে সাফাই করে দু-টুকুরো করলে ঝকঝকে মুক্ত দেখা যায়। এই খোলটি একাধিক প্রকোষ্ঠে বিভক্ত, কুন্ডলীর শীর্ষবিন্দু থেকে প্রকোষ্ঠ বাইরের দিকে গেছে। একেবারে বাইরের প্রকোষ্ঠটি আকারে বৃহত্তম। প্রাণীটি এই সবচেয়ে বড় প্রকোষ্ঠটিতে থাকে। অন্যান্য প্রকোষ্ঠ, প্রাণীটি যে গ্যাস শরীর থেকে নির্গত করে, তাতে ভরা থাকে, যার ফলে প্রাণীটি জলে ভেসে থাকতে পারে, ডুবে যাওয়ার ভয় থাকে না।

তারা মাছ, ভঙ্গুর তারা, পালকওয়ালা জলচর প্রাণী এবং জলচর প্রাণী (Star Fish, Brittle Stars, Feather Stars, Sea Urchins and Sea Cucumbers)

এই শ্রেণীর জলচর প্রাণীর ক্ষেত্রে পাঁচ সংখ্যাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। পা বা হাত, কর্ষিকা সবই পাঁচ বা পাঁচের গুণিতক। চুণ-জাতীয় পদার্থে তৈরি ছোট ছোট পাতের মতো খোলস এদের চামড়ার সঙ্গে লাগানো থাকে।

তারা মাছের (Star Fish) হাত বা পা সংখ্যায় সাধারণত পাঁচটি—এরা চ্যাপটা মোটা পাতের মতো দেহ থেকে বেরিয়ে এসেছে। কখনও কখনও অবশ্য চারটি বা ছটি হাত বা পা-ও দেখা যায়। একটি পা বা হাত ভাঙলে সেখানে আবার নতুন উপাঙ্গ তৈরি হয়ে যায়। তারা মাছের কোনো কোনো উপশাখায় দেখা যায় যে যদি ভেঙে যাওয়া হাত বা পায়ের সঙ্গে খানিকটা চাকতির মতো বেরিয়ে এসেছে, তাহলে চারটে নতুন হাত বা পা তৈরি হয়ে দ্বিতীয় একটি তারা মাছের জন্ম হয়। যে-সব জেলে ঝিনুক কুড়োয় তারা জানে যে তারামাছ ঝিনুকের শত্রু। কিন্তু এই নতুন উপাঙ্গ তৈরির কথাটা তারা জানে না। যদি তাদের জালে তারামাছ ধরা পড়ে, তাহলে জেলেরা তারামাছকে দুখন্ড করে সাগরে ফেলে দেয়। ভাবতেও পারে না যে মেরে ফেলার বদলে পরোক্ষে ওদের বংশ বৃদ্ধিতে সাহায্য করা হল।

তারা মাছ ((Star Fish) এর হাত বা পায়ের ভেতরের দিকে নরম মাংসল আঙুলের মতো উপাঙ্গ আছে যার নাম টিউব ফিট (Tube Feet) বা নলপদ। এগুলো ফাঁপা আর এদের শেষ প্রান্তে রয়েছে চোষক বা সাকার (Sucker)। এগুলোর সাহায্যে জল টেনে নিয়ে আর বের করে দিয়ে তারামাছ শিকার ধরে। জল টানায় সাময়িক শূন্যতা (Vaccum)
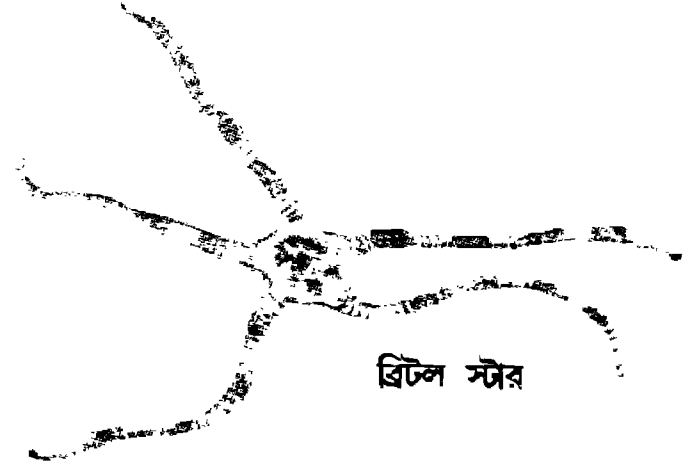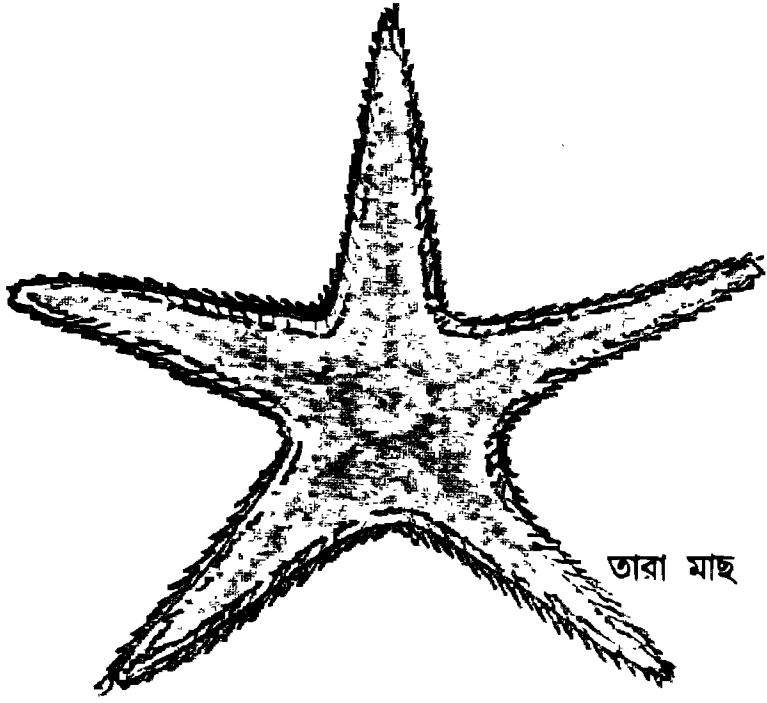
হয়, ফলে নলপদে শিকার আটকে যায়। এই নলপদের সাহায্যে তারামাছ চলাফেরা করে। কোনো ঝিনুকের সন্ধান পেলে নলপদের সাহায্যে এরা ভক্ষ্য প্রাণীটিকে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে, ফলে ক্রমাগত টান পড়ার ফলে প্রাণীটি বাধ্য হয় খোলের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে। কিছু কিছু তারামাছের খাবার নেওয়ার ধরন বিচিত্র। এরা ঝিনুকের নরম শরীরের ওপর নিজেদের মুখের ভেতর থেকে পাকস্থলীটিকে উগড়ে দেয়, তারপর পাচক রস নির্গত করে ধীরে ধীরে প্রাণীটিকে হজম করে ফেলে। পেটভরে খাওয়া হলে আবার মুখের ভেতর পাকস্থলীটিকে টেনে নেয়।

ভঙ্গুর তারা বা ব্রিটল স্টার দেখতে তারামাছের মতোই, শুধু কেন্দ্রীয় চাকতিটি ছোট আর পাঁচটি পা অনেক লম্বা। এদের নামকরণের উৎস হল চটপট আক্রান্ত উপাঙ্গ বা পা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করবার ক্ষমতা। কিছু কিছু ভঙ্গুর তারা বা ব্রিটল স্টার সামুদ্রিক প্রাণী (সী ফ্যান) ওদের জড়িয়ে ধরে বাস করে। এদের রঙ্ ওদের রঙের সঙ্গে এতই মিলে যায় যে আলাদা করে নজরে পড়ে না। অন্যান্য ধরনের ভঙ্গুর তারা স্পঞ্জের দেহের ভেতর ফাঁপা অংশে থেকে যায়।

পালকওয়ালা জলচর প্রাণী (Feather Stars) ভঙ্গুর তারার মতোই দেখতে, শুধু এদের পায়ে সাজানো রয়েছে অসংখ্য সূক্ষ্ম পালকের মতো দেখতে উপাঙ্গ। পায়ের নীচে ভেতর দিকে ছোট উপাঙ্গও আছে, যাদের আঙুলের মতো ভাঁজ করে এরা নুড়ি বা পাথর জড়িয়ে ধরে বিশ্রাম নেয়। এদের চলাফেরা দেখতে খুব সুন্দর লাগে। এরা ব্যালে নর্তকীর মতো পাগুলো নাড়িয়ে হালকাভাবে সাঁতার কেটে এগিয়ে যায়।

সামুদ্রিক শামুক : প্রথমে দেখলে মনেই হবে না এরা তারা মাছের জ্ঞাতি। এদের দেখলে অসংখ্য সরু লম্বা কাঁটাযুক্ত বলের মতো মনে হয়। ঠিক যেন খুদে সজারু। কাঁটাগুলোর মাঝখানে ভালো করে নজর করলে চোখে পড়বে দশ সারি নলপদ বা নল, যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই কাঁটাগুলো বিষাক্ত। সুতরাং সাবধানে হাতে নেওয়া উচিত। কাঁটা বেশি দেখলে মনে হবে এরা বুঝি খুবই নিরাপদ, কেউ সহজে আক্রমণ করতে সাহস করে না, কিন্তু কিছু কিছু মাছ এদের গিলে খায়। ট্রিগার ফিশ (Trigger fish) সামুদ্রিক শামুককে মুখে নিয়ে ঝাঁকাতে থাকে (ঠিক যেন কুকুরের মুখে ইঁদুর ছানা) যতক্ষণ না কাঁটাগুলো খসে পড়ে। তারপর শক্তি দিয়ে এরা ওই শামুকের খোলা ভেঙে ভেতরের নরম শাঁস খেয়ে ফেলে । সামুদ্রিক শামুকের খোলসকে বলা হয় 'টেস্ট' (Test)—এটি দেখতে খুব সুন্দর, গায়ে অসংখ্য গুটি বা বোতামের মতো অংশ সারিবদ্ধভাবে সাজানো
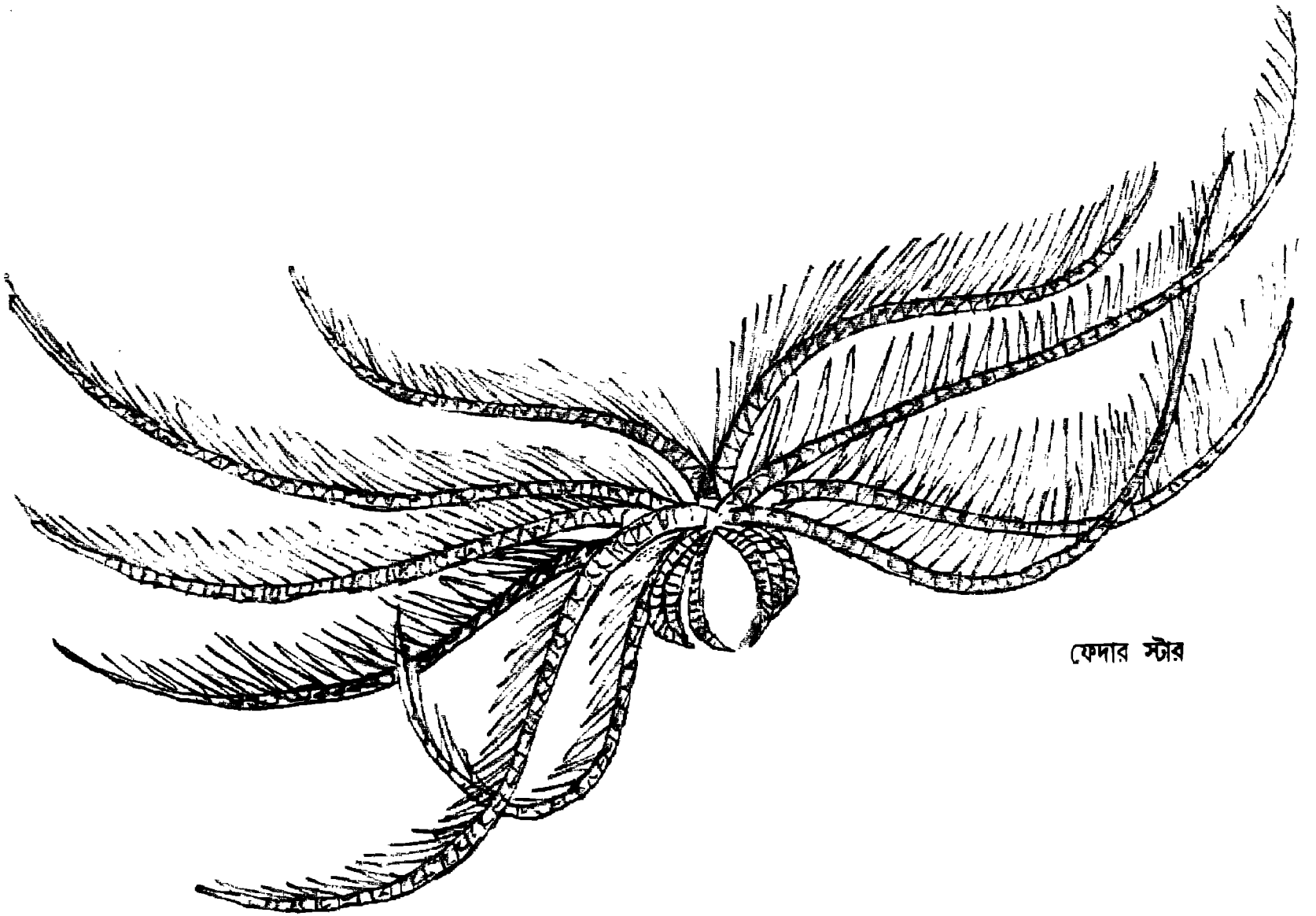
ফেদার স্টার
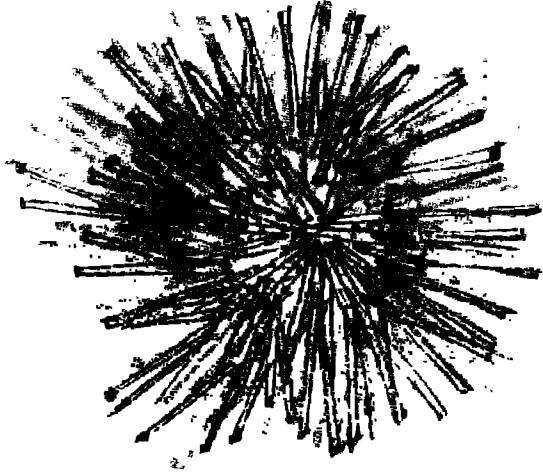
সী আরচিন
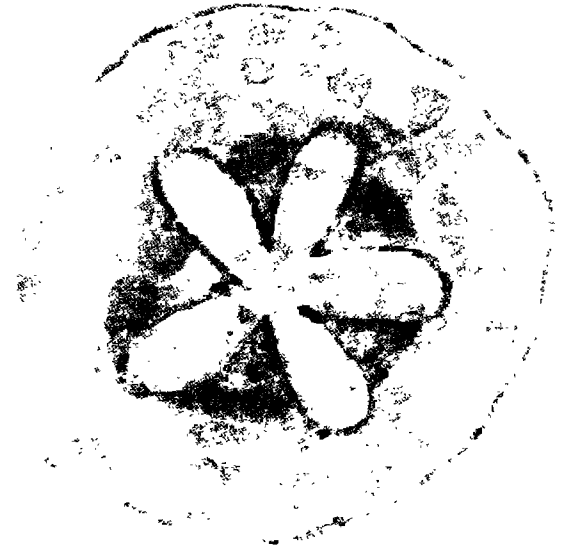
স্যান্ড ডলার

থাকে, তাও কিন্তু পাঁচের গুণিতক হিসেবে। এক জাতীয় সী আরচিনের কাঁটা স্কুলের ছেলেমেয়েরা শ্লেটে কলমের বদলে ব্যবহার করে।

জলচর আর এক প্রাণীর (সী কিউকাম্বারের) শরীর লম্বাটে, এদেরও দেখলে তারা-মাছের স্বজাতি বলে মনে হয় না। কিন্তু এদের শরীরে আছে পাঁচ সারি নলপদ বা নল আর মুখে আছে দশটি শাখাযুক্ত কর্ষিকা—যা থেকে বোঝা যায় এরা স্টার ফিশেরই জ্ঞাতি। সামান্য বিরক্ত করলেই বা চেপে ধরলেই এরা দেহের ভেতরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাইরে বের করে ফেলে দেয়, আবার পরে নতুন দেহ যন্ত্র তৈরি হয়। ইন্দোনেশিয়া আর চীনে সী কিউকাম্বার শুকিয়ে নিয়ে খাদ্য হিসেবে পরিবেশন করা হয়।

কেক আরচিন (Cake Urchin) বা স্যান্ড ডলার (Sand Dollar)-এর দেহ চ্যাপটা চাকতির মতো, তাতে তারার মতো নকশা কাটা। আমাদের দেশের সমুদ্রতীরে কিন্তু এদের দেখা যায় না।

আমাদের পূর্বসূরীদের কথা (Our Ancestors)

সমুদ্রের তীরে হাঁটতে হাঁটতে কখনও কখনও চোখে পড়বে জায়গায় জায়গায় পাথরের ফাঁক দিয়ে ফিনকি দিয়ে জল বেরিয়ে আসছে। আরও ভালো করে দেখলে নজরে পড়বে ছোট ছোট পিপের আকারের নরম তুলতুলে পিচ্ছিল দেহের প্রাণীই তার শরীরে দুটি খোলা অংশ দিয়ে জল বের করে দিচ্ছে। এগুলো সী স্কুইয়ারট (Sea Squirt)। সাধারণত এরা হলুদ, কমলা, লাল বা গোলাপী ধরনের উজ্জ্বল রঙের হয়। এদের দেখলে স্পঞ্জ বলে ভুল হয়।

এদের জ্ঞাতি হল অ্যাকর্ন ওয়র্ম (Acorn Worm)। এ-ধরনের প্রাণীর দেহ লম্বা, সামনের দিক ভোঁতা। এখন বিলোপ হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য ভারতে এরা প্রায় বিরল। এদের প্রধান বসতি ছিল রামেশ্বরমের কাছে ক্রুসেডাই (Krusadai) দ্বীপে, কিন্তু বহুলোক শুধু

এদের নমুনা সংগ্রহ করে করে এমন অবস্থা করেছে যে আজ এরা বিলোপ হয়ে যাচ্ছে। এখন অবশ্য কঠোর সংরক্ষণ নীতির নেওয়ায় অবস্থার কিছুটা হেরফের হয়েছে।

আমাদের আর একটি পূর্বসূরী হল থুরকিনা মাছ। এদের আকার অনেকটা মাছের মতোই। পিঠের ওপর আর লেজের দিকে দুটি পাখনা আছে। অথচ মাথা নেই। এদের দেহের দু-পাশে ইংরাজি ভি (v) অক্ষরের মতো সার দেওয়া পেশী দেখেই চিনতে পারা যায়। পূর্ব উপকূলে জোয়ার ভাঁটা যেখানে প্রবল সেখানে এদের দেখা যায়। তবে বেশির ভাগ সময়েই এরা বালিতে লুকিয়ে থাকে। বালিতে জোরে জোরে পা ঠুকলে থুরকিনা মাছ ভয় পেয়ে বালির গর্ত থেকে লাফিয়ে বাইরে আসে, আবার একটু পরেই বালিতে ঢুকে যায়।

কিন্তু এদের সবাইকে হঠাৎ আমাদের পূর্বসূরী বলা হল কেন? আমরা অর্থাৎ মানুষ মেরুদন্ডী প্রাণী। কিন্তু যখন মায়ের গর্ভে থাকি, তখন মেরুদন্ড পূর্ণাঙ্গ রূপ পাবার আগে শক্ত দন্ডের আকারের একটি জিনিস থাকে, যার নাম নোটোকর্ড (Notochord)। এর আগে যত প্রাণী সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, কারোরই নোটোকর্ড নেই। কিন্তু বাকিদের জীবনচক্রের কোনো না কোনো অংশে নোটোকর্ডের আছে। সুতরাং এরা অমেরুদন্ডী ও মেরুদন্ডী প্রাণীর মধ্যে সেতুর কাজ করে। মেরুদন্ডী প্রাণীদের মধ্যে আছে মাছ, ব্যাঙ, সরীসৃপ পাখি আর সমস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণী।
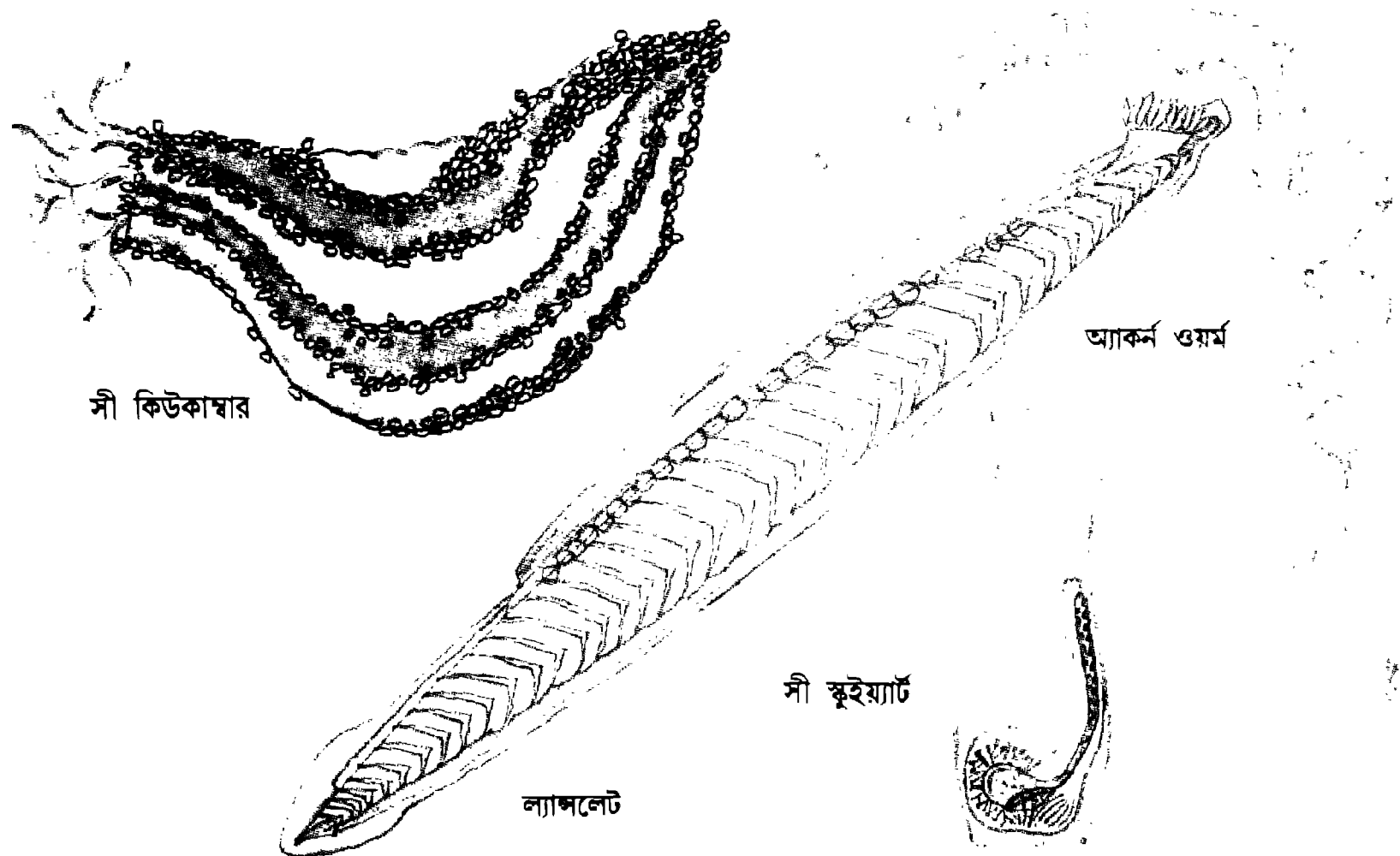
মাছ (Fishes)

মাছ দেখলে প্রথমেই আমরা ভাবি তা কত রকমের। কেমন খেতে। স্বাদই বা কিরকম। যে সব মাছ আমরা খাই, তারা আমাদের যথেষ্ট পরিচিত। কিন্তু তা ছাড়াও আরও অনেক রকমের মাছ আছে যা মেলা মুশকিল ও অপরিচিত। এই বিভিন্ন মাছের রঙ, আকারগত পার্থক্য আর স্বভাবের তফাৎ তাই যথেষ্ট গবেষণার বিষয়।

মাছের শরীরে পাতলা পর্দার মতো উপাঙ্গ থাকে। একে বলে পাখনা (Fin)। শরীরের শেষ প্রান্তে লেজের সঙ্গে পাখনা থাকে, আমাদের কাঁধ ও নিতম্ব যেখানে, মাছের শরীরেরও ঠিক একই জায়গায় দুই জোড়া পাখনা দেখা যায়। পেটের মাঝ বরাবর একটি আর পিঠে এক বা একাধিক পাখনা থাকে (অবশ্য মাছের কাঁধ বা নিতম্ব বলে কিছু নেই)। এরা কানকোর সাহায্যে শ্বাসক্রিয়া চালায়, এগুলো অগুণতি বাঁকানো চুলের মতো উপাঙ্গের সমষ্টি যাতে প্রচুর পরিমাণে রক্ত চলাচল হয়। মাছ মুখ দিয়ে জল টেনে মুখ বন্ধ করে। তারপর কানকোর ভেতর দিয়ে সেই জল চালিয়ে দেয়। জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন কানকো গ্রহণ করে আর কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়ে।

আমরা জানি জল বাতাসের চেয়ে ঘন। মাছ অতি সহজেই জলে সাঁতার কাটতে পারে। সাঁতার কাটবার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির বেশির ভাগই মাছ সংগ্রহ করে লেজের পাখনার পার্শ্ব সঞ্চালনের সাহায্যে। সেই সঙ্গে মাছের দেহও দুই পাশে নড়তে থাকে। যে সব পাখনা জোড়ায় জোড়ায় থাকে, সেগুলো সাঁতারে সাহায্য করে না। এগুলো গতিকে নিয়ন্ত্রণ বা রোধ করবার কাজে লাগে। অন্যান্য পাখনাগুলো মাছকে দেহের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া কাঁধের কাছের পাখনা সামনে পেছনে নড়াচড়া করে মাছকে প্রয়োজন মতো স্থির থাকতে সাহায্য করে যাতে স্রোতের টানে তারা এগিয়ে না যায়। এই পাখনাগুলো না নাড়ালে কানকো থেকে যে জল বেরোয়, তা পেছন দিকে ছিটকে যায়, ফলে মাছের ওপর সামনের দিকে এগোবার জন্য চাপ পড়ে। পাখনার সাহায্যে মাছ ইচ্ছে মতো গতি নিয়ন্ত্রিত করতে পারে।

দৃষ্টি, শ্রবণক্ষমতা, স্পর্শ, গন্ধ আর স্বাদ—এই পাঁচটি বোধ ছাড়াও মাছের একটি ষষ্ঠেন্দ্রিয় আছে—মাছ তরঙ্গ অনুভব করতে পারে। দেহের দু-পাশে একটি করে রেখা আছে, যাতে ছোট ছোট স্নায়ু যুক্ত গর্ত আছে। মাথায় এই রেখা একাধিক শাখায় ভাগ হয়ে গেছে। অনুরূপ অনুভূতির সাহায্যেই আহত মাছের সন্ধান পেয়ে হাঙর ওই ছটফট করা মাছের কাছে এগিয়ে আসে।

বেশির ভাগ মাছই জলে হাজার হাজার ডিম পাড়ে। সব ডিম ফুটে যদি বাচ্চা বের হতো তাহলে এতদিনে সাগর বা নদী ভরে যেত মাছেই। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ডিম ফুটে চারা মাছ বের হলে শত্রু পক্ষ (অর্থাৎ অন্যান্য মাছ) তাদের খেয়ে ফেলে। হয়ত দু-চারটি ভাগ্যক্রমে বেঁচে যায়। কিছু কিছু মাছ ডিম পাড়ে না। এরা একেবারে বাচ্চার জন্ম দেয়। একই শ্রেণী কিন্তু স্তন্যপায়ী নয়, কারণ শিশু মাতৃদুগ্ধ পান করে না। কিছু কিছু মাছ আবার অল্প সংখ্যক ডিম পাড়ে আর ডিম ও তার থেকে বের হওয়া বাচ্চাকে পাহারা দেয়। উদাহরণ হিসেবে সী হর্সের (Sea Horse) কথা বলা যেতে পারে। একে দেখলে মাছ বলে মনেই হবে না। দেখতে অনেকটা দাবার ঘুঁটির ঘোড়ার মতো মাথাটা যেন পৌরাণিক বা কল্প কাহিনীর ঘোড়া লেজ বানরের লেজের মতো লম্বা আর দরকারে এই লেজ ছোট লতাপাতা বা সী ফ্যানকে জড়িয়ে ধরতে পারে। এদের শরীর শক্ত বর্মের মতো খোলসে মোড়া। পুরুষ সী হর্সের পেটে বটুয়ার মতো থলি থাকে (অনেকটা ক্যাঙারুর পেটের থলির মতো)। সঙ্গমের সময় স্ত্রী সী হর্স এই থলিতে ডিম পাড়ে। যতদিন ডিম ফুটে বাচ্চা বের না হয়, তত দিন ডিমগুলো থলিতেই থাকে। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সী হর্স শিশুরা পিতৃগর্ভ থেকে এসেছে। সী হর্সেরই এক জ্ঞাতি হল পাইপ ফিশ (Pipe Fish)—এদের পুরুষের পেটে এক জোড়া পাতের মতো উপাঙ্গ থাকে যাতে এরা সংগ্রহ করে ডিম।

এক ধরনের মাছ ক্যাট ফিশ এরা মুখের ভেতর ডিম নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। পাছে ডিমের ক্ষতি হয়, সেই ভয়ে এরা ক্ষিদে পেলেও খায় না। যখন ধরা পড়ে, তখন ডিম বার করে দেয়। ডিমগুলোর আকার কাঁচের গুলির মতো। ডোয়ার্ফ গৌরামি (Dwarf Gourami) বাতাসে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয় আর ইন্ডিয়ান প্যারাডাইস ফিশে (Indian Paradise fish) শিশু পালনে চমকপ্রদ। যখন পুরুষ মাছটি সঙ্গমের জন্য প্রস্তুত হয়, তখন মুখ দিয়ে শয়ে শয়ে বাতাসের বুদবুদ তৈরি করে। তারপর স্ত্রী মাছটিকে প্রলুব্ধ করে সঙ্গমে, এবার ডিম উৎপাদন করা হয়ে গেলে ওই স্ত্রী মাছ প্রসূত ডিম মুখে তুলে নিয়ে আঠালো বুদবুদগুলো গায়ে গায়ে লেগে যে বাতাস ভরা বাসা তৈরি হয়, তার মধ্যে রেখে দেয়। তারপর স্ত্রী সঙ্গীটিকে তাড়িয়ে পুরুষটি নিজেই ডিমের
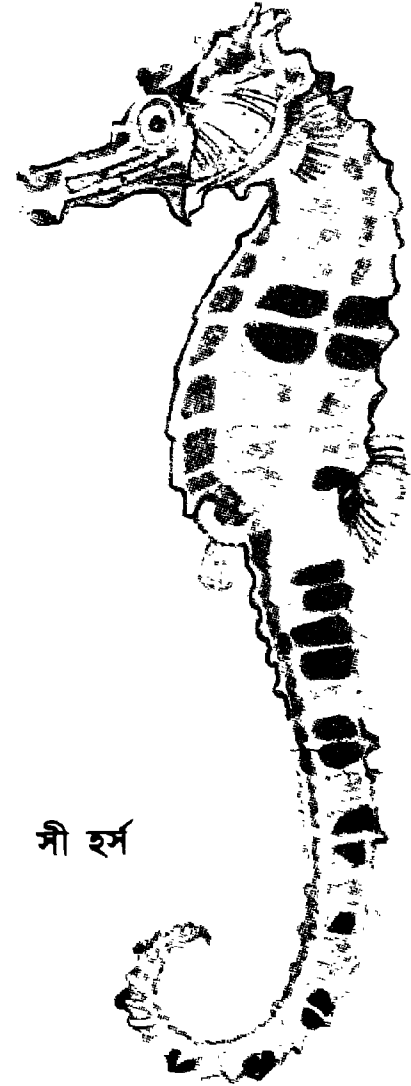
সী হর্স
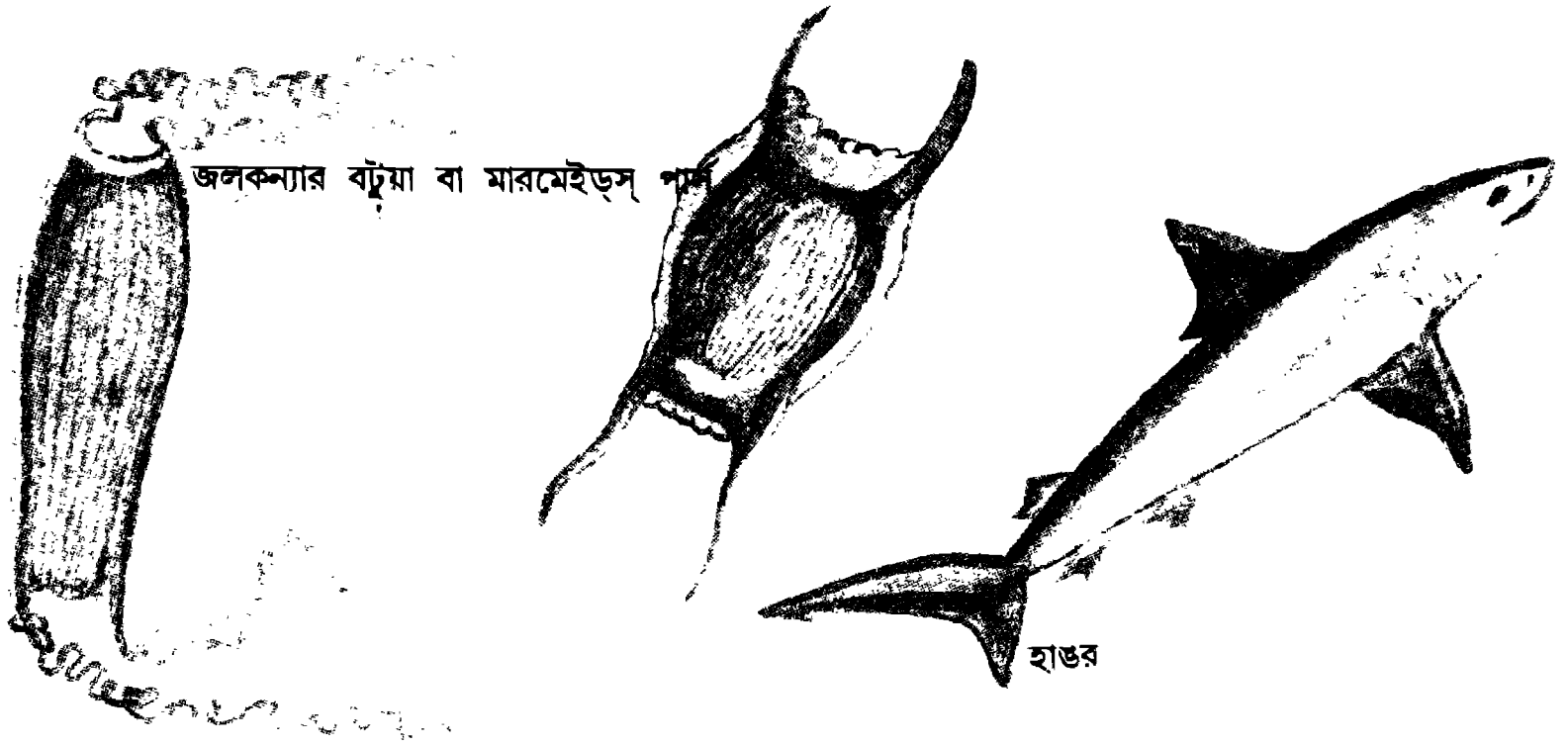
দায়িত্ব নেয়। ডিম বা খুদে মাছ (ডিম ফুটে সদ্যোজাত) হঠাৎ কোনো ভাবে বাইরে বেরিয়ে এলে সন্তর্পনে তাকে আবার বাসার ভেতর নিয়ে নেওয়া হয়। এই ব্যবস্থা শিশুদের স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত।

শুনে অবাক লাগবে, সব মাছের গায়েই কাঁটা নেই। শার্ক বা হাঙর (Shark) এবং তাদের জ্ঞাতি ভাইদের কঙ্কাল কোমলাস্থিতে তৈরি (ঠিক যে ধরনের পদার্থে আমাদের কানের লতি বা নাকের ডগা তৈরি হয়েছে)। হাঙরের লম্বায় 30 সেন্টিমিটার থেকে 15 মিটারের বেশিও হয়। এদের সামান্য অংশই মানুষ খেকো—যেমন গ্রেট হোয়াইট শার্ক (Great White Shark) এরা দৈর্ঘ্যে প্রায় 6 মিটার পর্যন্ত। তবে কোনো জাতের হাঙরকেই বিরক্ত না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। ছোট আকারের হাঙরও (যা কিনা মাত্র 1.5 মিটার লম্বা) বিরক্ত হলে এরা দাঁত দিয়ে মাংস কামড়ে কেটে নিতে পারে। এদের দাঁতের বেশ কয়েকটি সারি লক্ষ্য করা যায়। একটি দাঁত ভেঙে গেলে পেছনের সারির সেই অংশের দাঁত সামনে এগিয়ে এসে হারানো দাঁতের জায়গা দখল করে।

যে-সব হাঙর সাগরের জলের একেবারে নীচে বাস করে না, তাদের সব সময়েই সাঁতার কাটতে হয়। এর ফলে মুখ দিয়ে জল ঢুকে কানকোয় জল যায়। যদি দেখা যায় সংরক্ষিত এবং প্রদর্শিত কৃত্রিম জলাশয়ে (Oceanariums) সমুদ্র ও মহাসাগরের জল এবং (Aquariuns) কোনো হাঙর ক্লান্ত হয়ে নিশ্চল এবং একেবারে নীচে পড়ে তাহলে ডুবুরী নামিয়ে কৃত্রিম উপায়ে তার কানকোয় জল ঢোকাবার ব্যবস্থা করতে হয়। ডুবুরী হাঙরকে ধরে ধরে জলে চলাফেরা করে, এতে ক্রমশ হাঙরটি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। এমন

কি হাঙর যখন ঘুমোয়, তখনও সে অলস মন্থর গতিতে সাঁতার কাটে, যা কিনা অন্যান্য জাতের মাছেদের স্বভাববিরুদ্ধ।

অনেক জাতের হাঙর সমুদ্রের একেবারে তলায় বাস করে। এদের সব সময়ে সাঁতারের দরকার হয় না। এরা এক জাতের খোলকের (Capsule) মধ্যে ডিম পাড়ে, খোলকটিকে বলা হয় 'জলকন্যার বটুয়া' বা 'মারমেইডস্ পার্স' (Mermaid's purse)। এই বটুয়ার কোনে কোনে সুতোর মতো অংশ আছে যা দিয়ে বটুয়াটি নিরাপদ স্থানে আটকে থাকে। বেশ কয়েকমাস পরে ডিম ফুটে শিশু হাঙরের জন্ম হয়।

হাঙরের চামড়ায় ছোট ছোট আঁশ থাকে। এগুলো পেছনের দিকে ঢালু। সে-জন্যই হাঙরের মুখ থেকে লেজের দিকে হাত বুলালে নরম লাগে। কিন্তু লেজের দিক থেকে মুখের দিকে হাত বুলালে শিরীষ কাগজের মতোই খসখসে বা অমসৃণ মনে হবে। এক সময়ে হাঙরের চামড়া বা শ্যাগ্রিন (Shagreen)-কে তাই কাঠ পালিশ করার কাজে ব্যবহার করা হত। এখন এই চামড়া দিয়ে উন্নত মানের জুতো, হাতব্যাগ আর বটুয়া তৈরী হয়।

এছাড়া হাঙরের (Shark) যকৃতে তেল থাকে যা ভিটামিন 'এ'-তে ভরপুর। এই তেল রাতকানা রোগীদের টনিক।

সবচেয়ে আজব ব্যাপার হল যে বৃহত্তম হাঙর যার নাম **হোয়েল শার্ক** (Whale shark) মানুষের কোনো ক্ষতিতে নেই। এমন কি মানুষ একে স্পর্শ করলেও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে না। এর কানকোর পেছন দিকটা কাজ করে। এই হোয়েল শার্ক মুখ খুলে সাঁতার দেয় আর জলের সঙ্গে সঙ্গে ভেসে আসা ছোট ছোট জলচর প্রাণীদের খেয়ে ফেলে এদের কানকো ছাকনির কাজ করে থাকে। জল বেরিয়ে যায়, আটকে পড়ে প্রাণীরা, তখন হোয়েল এদের খায়।

হ্যামার হেডেড শার্কের (Hammer Headed Shark) মাথা ইংরাজি 'T' অক্ষরের মতো। অর্থাৎ ঠিক অনেকটা হাতুড়ির মতো দেখতে। চোখটা বসানো আগায়। করাতের

প্যারাডাইস ফিস

মতো দেখতে স' ফিশের (Saw Fish) নাক। মুখের এক দিক ঝোলানো। দু-ধারে করাতের মতো দাঁত সাজানো। কথিত আছে যে মাছের ঝাঁকের ভেতরে গিয়ে যখন স' ফিশ আক্রমণ করে, তখন মাথা দু-পাশে নাড়ায়। দাঁতের আঘাতে মাছ টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

হাঙরের জ্ঞাতি হল চওড়া চ্যাপটা মাছ স্টিং রে (Sting ray)। এদের চেহারার সঙ্গে হাঙরের কোনো মিলই নেই। এই শ্রেণীর দেহ ঘুড়ির মতো, লেজ সরু লম্বা। আর শরীরের একেবারে ওপরে চোখ। নীচের দিকে মুখ, নাকের ছেঁদা আর কানকোর কাটা অংশ দেখা যায়। এর চোখের পেছনে একজোড়া কাটা অংশ থাকে, যা ক্রমাগত খোলে আর বন্ধ হয়। জল এই ফুটো দিয়ে ঢোকে। বের হয় কানকো দিয়ে। এদের লেজের গোড়ায় শিরদাঁড়ার মতো শক্ত হাড় থাকে (কখনও এই হাড় একাধিকও হয়), যার দু-ধারে করাতের মতো দাঁতের সারি সাজানো থাকে। ভয় পেলে বা বিরক্ত হলে চাবুকের মতো এরা লেজটিকে দোলায় এবং শিরদাঁড়ার মতো শক্ত হাড় দিয়ে আঘাত করে আক্রমণকারীদের। তাই জেলেরা স্টিং রে-কে ধরতে পারলে প্রথমেই এই হাড়ের মতো অংশটি কেটে দেয়। তাছাড়া এই অংশটির দু-ধারে বিষগ্রন্থি (Venom Glands) আছে—এই বিষের ক্রিয়া যথেষ্ট বেদনাদায়ক। এ-ধরনের প্রাণীর গায়ের রঙ্ পিঠের দিকে গাঢ় বাদামী (ঠিক সমুদ্রের তলার কাদার মতো)। কিন্তু পেটের দিক সাদা।

কাউ নোজড্ রে (Cow-nosed ray)-র শরীরের দু-পাশে চ্যাপটা পাতের মতো উপাঙ্গ অর্থাৎ একটা অংশের ওপর আর এক অংশ আছে, যা নাড়িয়ে সহজেই এরা সাঁতার কাটতে পারে। তখন এদের দেখলে মনে হয় পাখি ডানা ঝাপটাচ্ছে।

মান্টা (Manta) বা **ডেভিল রে** (Devil ray) একই রকম, শুধু মাথায় একজোড়া শিঙের মতো উপাঙ্গ আছে। যেন কাল্পনিক শয়তানের মাথার শিঙ জোড়া। এরা অনেক সময় সমুদ্রের জলের ওপর লাফিয়ে ওঠে আবার ঝপাং করে জলে পড়ে। সেই শব্দ অনেক দূর থেকে শুনতে পাওয়া যায়।
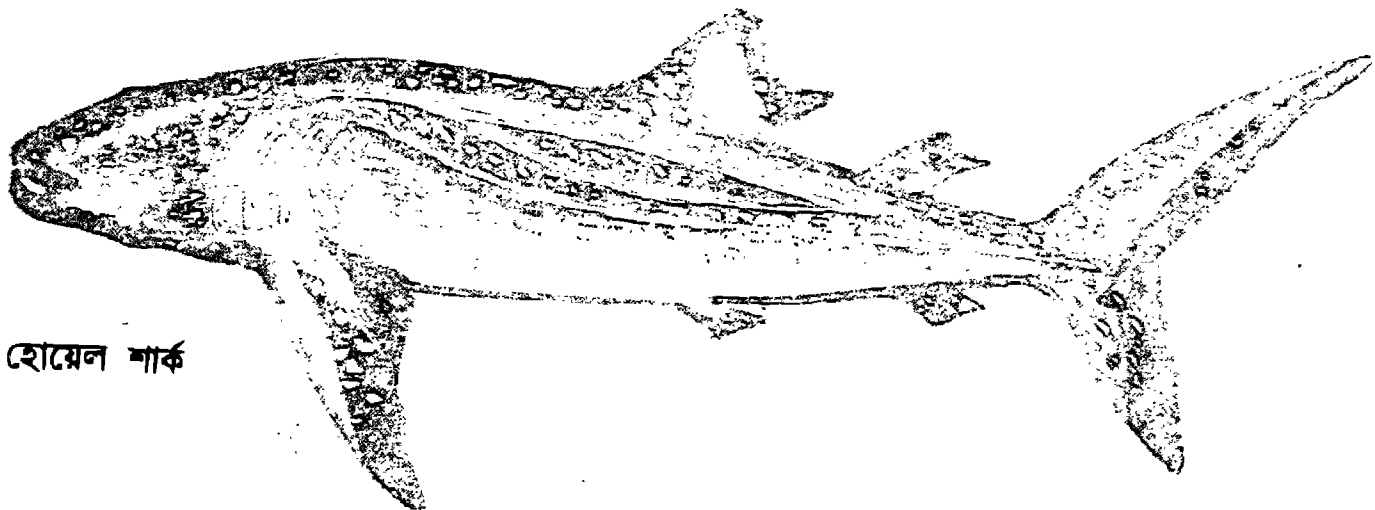
হোয়েল শার্ক
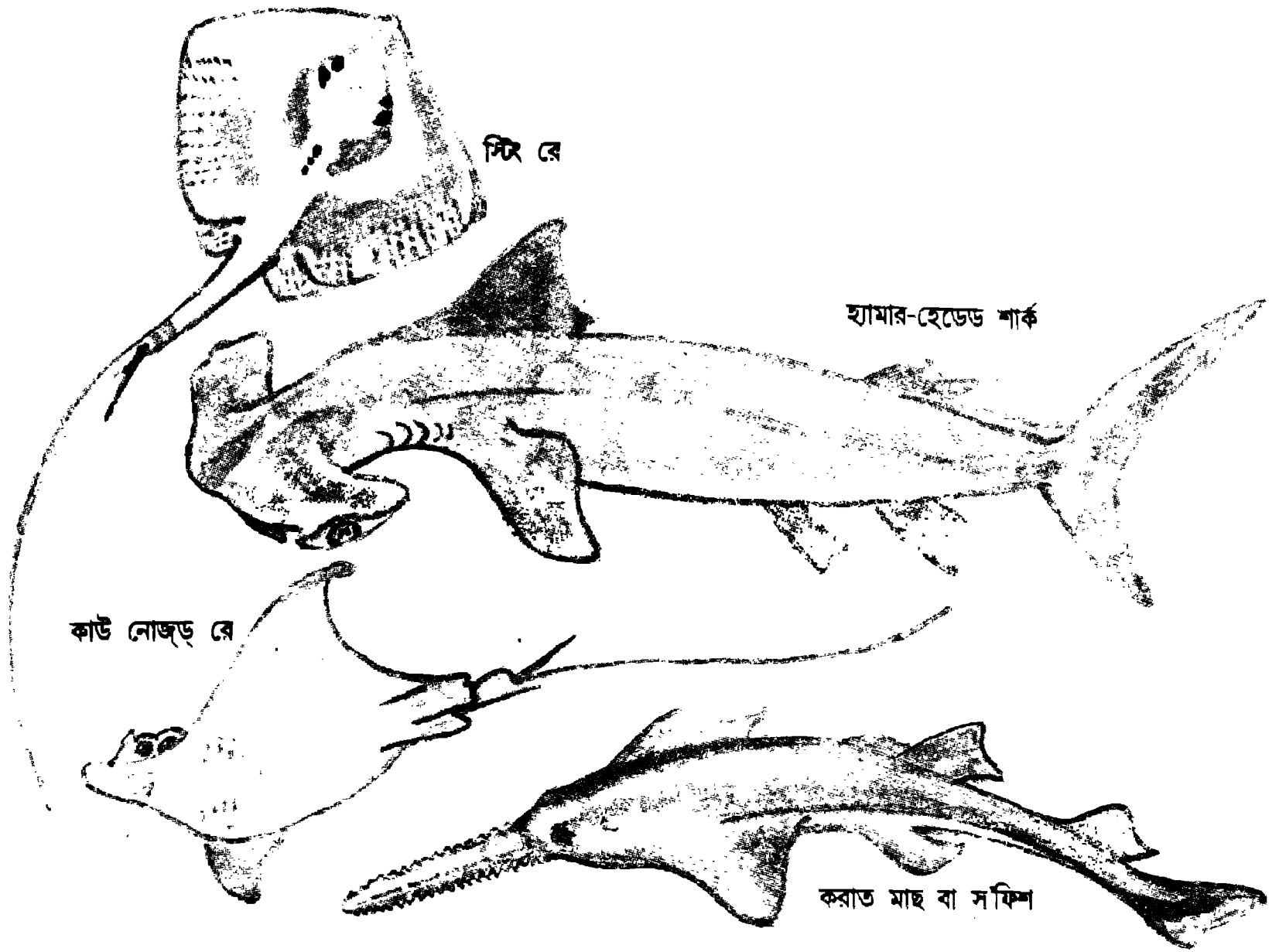
ইলেকট্রিক রে (Electric ray) নিশ্চল অবস্থায় সাগরের তলদেশে পড়ে থাকে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এরা শত্রুর কবল থেকে আত্মরক্ষায় অসমর্থ, কিন্তু দরকার মতো যখন তড়িৎপ্রবাহ পাঠায় বা ইলেকট্রিক শক দেয়, তা আক্রমণকারীকে ঘায়েল করবার পক্ষে যথেষ্ট।

পাঁকাল মাছ (Eels) আর মোরে (Moray) সাঁতার কাটবার সময় সমস্ত শরীরকে এপাশ ওপাশ নাড়াতে থাকে, ঠিক সাপেরই মতো। আগেই বলা হয়েছে যে **ঈগল বা কাউ নোজড্ রে** (Eagle or cow nosed ray) দেহের দুই পাশের পাখনা ডানার মতো নাড়িয়ে সাঁতার কাটে। স্টিং রে-র ক্ষেত্রে, পাখনার প্রান্ত দেহ বরাবর ওপর নীচে দোলে। যেমন বাতাসে পর্দা দুলে থাকে। **সী হর্স** (Sea Horse) লেজের সাহায্যে সাঁতার কাটে না —এরা পিঠের পাখনা অত্যন্ত দ্রুত চালিয়ে সাঁতার কাটে এ-সময়ে সেকেন্ডে দশেরও বেশি ঢেউ হয়, যা আমরা আলাদা আলাদা ভাবে অনুভব বা দেখতে পাই না।
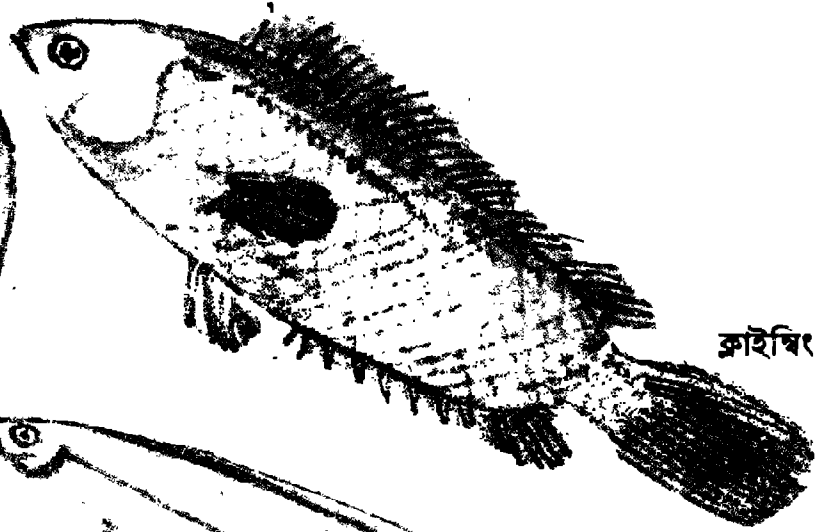
ক্লাইম্বিং পার্চ
ইলেকট্রিক রে
শিশু ঈল
মাড স্কিপার
পূর্ণাঙ্গ ঈল
উড়ুক্কু মাছ বা ফ্লাইং ফিশ

লতানে মাছ (ক্লাইম্বিং পার্চ) পাখনা ও দেহের সাহায্যে হাঁটতে পারে, কিন্তু সেটা খুব অদ্ভুত ভাবে। অনেক সময়েই দেখা যায় মিঠে জলের স্রোত ছাড়িয়ে ডাঙার ওপরে উঠে এসে এরা হেঁটে চলেছে। আসলে হাওয়ায় সোজাসুজি শ্বাসক্রিয়া চালাতে পারে বলে এভাবে ডাঙায় চলাফেরা করা ওদের সম্ভব হয়। প্রায় দুশো বছর আগে এক ইউরোপীয়ান পর্যটক যখন প্রথম এই মাছটিকে দেখেন তখন নাকি তালগাছ বেয়ে সেটি দেড় মিটার উঁচুতে উঠে গিয়েছিল।

আমাদের দেশে কাদায় বা পাঁকে যে মাছ মাডস্কিপার (Mudskipper) দেখা যায়, তারা খুবই চটপটে। এরা সূর্যের আলোয় আরাম করে। রোদ পোহানোই পছন্দ। চোখ দুটি আলাদা আলাদা ভাবে অর্থাৎ স্বাধীন ভাবে একে অন্যটির ওপর নির্ভর না করে এরা এদিক ওদিক দেখতে পারে। অর্থাৎ হয়তো এক চোখ দিয়ে সামনের জিনিস দেখছে আর অন্য চোখের দৃষ্টি পেছন দিকে। কেউ সামান্য একটু এদের দিকে এগোলেই লাফিয়ে উঠে এরা পালায়। এরাও শুকনো জায়গায় অনেকক্ষণ থাকতে পারে, অবশ্য যতক্ষণ কানকো ভিজে থাকে। অনেক সময়েই দেখা যায় এদের সম্পূর্ণ দেহ-ই জলের বাইরে ডাঙায়। শুধু লেজের শেষ প্রান্ত জলে ডুবে, সেই জন্যই একসময় ভাবা হতো নিশ্চয়ই এই মাছটির শ্বাসযন্ত্র লেজের ভেতরে আছে। এখন অবশ্য আমরা প্রকৃত রহস্য জেনেছি।

সমুদ্র তীর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে ভাসমান বোটে দাঁড়িয়ে অনেকেই **উড়ুক্কু মাছ বা ফ্লাইং ফিশের** (Flying) ওড়া দেখে থাকবেন। এরা 360 মিটার দূরত্ব এবং 9 মিটার উচ্চতা এক এক লাফে পেরোতে পারে। এরা কিন্তু আসলে ওড়ে না, বাতাসে ভেসে যায় মাত্র। উড়ুক্কু মাছের লেজের পাখনার নীচের ভাগ ওপরের ভাগের তুলনায় লম্বা আর মোটা। এটিকে দুই পাশে সজোরে নাড়িয়ে সমুদ্রের ওপরদিকে উড়ুক্কু মাছ গতি সংগ্রহ করে নেয়। তারপর যেই বাতাসে লাফিয়ে ওঠে। লম্বা পাখনা প্রসারিত হয়। ঠিক যেন উড়ো জাহাজের পাখার মতো। পাখনাগুলো পাখির ডানার মতো ঝাপটাঝাপটি করে না। বাতাসে দ্রুত কাঁপে। এক এক ক্ষেপে মাছটি 40 সেকেন্ড পর্যন্ত উড়তে পারে।

মাছ নানান উপায়ে প্রয়োজনীয় খাদ্য জোগাড় করে। শিকারী মাছেরা দ্রুত গতিতে শিকারের পেছনে ধাওয়া করে তাদের ঘায়েল করে ফেলে। গুপ্তভাবে ওঁত পেতে থাকা শিকারী মাছ ভক্ষ্য প্রাণীটির ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বার অপেক্ষায় থাকে, এদের দেহের রঙ প্রকৃতির সঙ্গে চমৎকারভাবে মিশ খেয়ে যায়, যাতে আলাদাভাবে এদের অস্তিত্ব ধরা পড়ে না।

কিছু কিছু মাছ আরও উন্নত উপায়ে চলে। **অ্যাঙ্গলার ফিশের** (Angler fish) মাথায় আছে শক্ত লম্বা হাড়ের মতো অংশ যার শেষ প্রান্তে এক গুচ্ছ লোম। সাধারণ অবস্থায় এটি মাথার সঙ্গে চ্যাপটা ভাবে লাগানো থাকে। কিন্তু মাছটি যখন ক্ষুধার্ত হয়, তখন এটি নিশ্চল

অ্যাঙ্গলার ফিশ
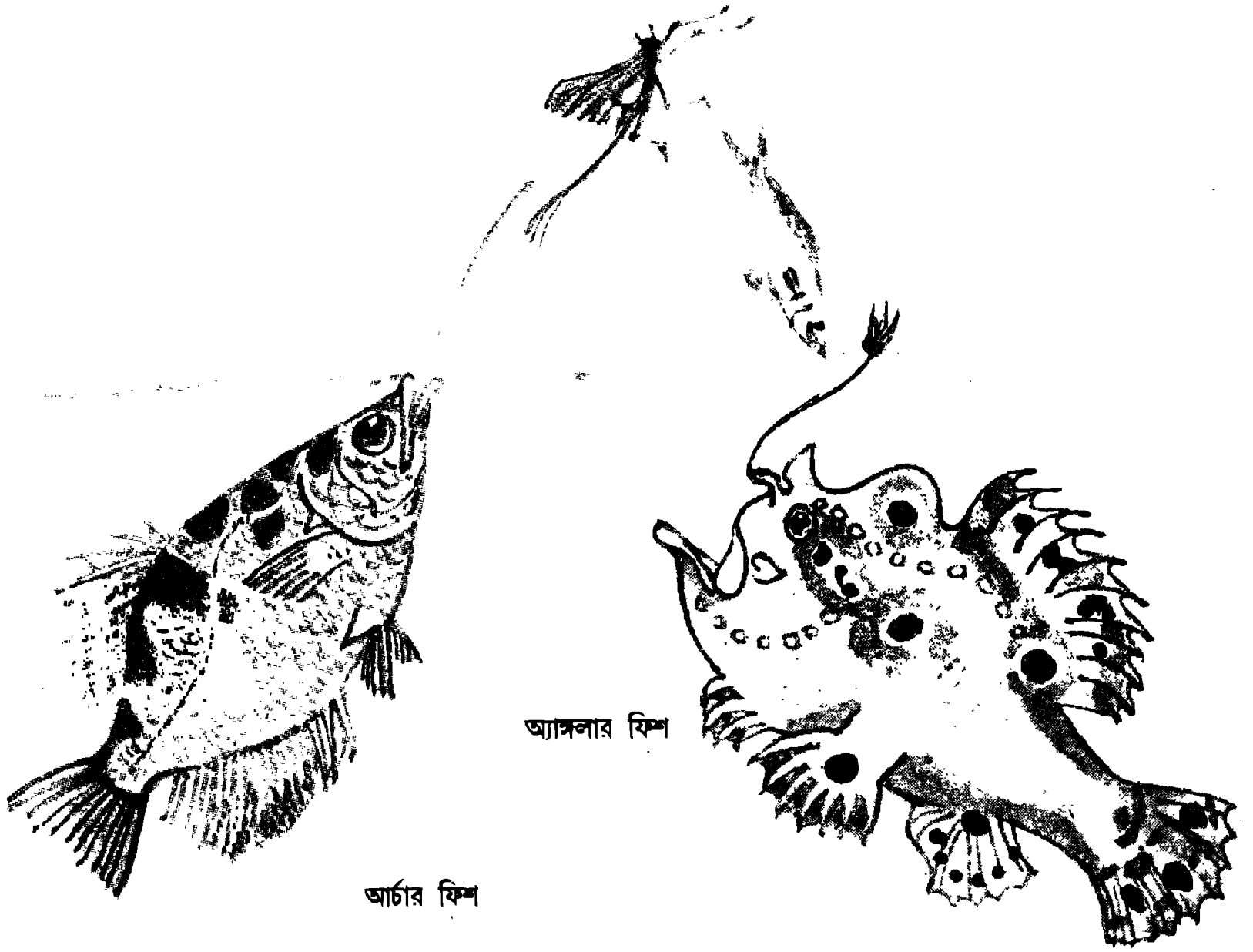
আর্চার ফিশ

দেহে থেকে ওই লম্বা অংশটিকে এদিক ওদিক নাড়তে থাকে। কৌতূহলী হয়ে অন্য মাছ ভাবে নিশ্চয়ই কোনো পোকা নড়ছে। কাছাকাছি এলেই এরা সেই মাছটিকে ধরে গিলে ফেলে।

আর্চার ফিশ (Archar fish) ভক্ষ্য প্রাণীর ওপর বন্দুকের গুলির মতো তোড়ে জল ছিটায়। এদের মুখের ভেতর উপরের অংশে গর্ত থাকে। এই গর্তে জিভ দিয়ে চাপ দিলে তা ঠিক নলের মত হয়। যখন এরা দেখে জলজ উদ্ভিদের গায়ে কোনো কীটপতঙ্গ বসেছে, তখন অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণের মতো জল ছিটিয়ে কীট বা পতঙ্গকে ঘায়েল করে খেয়ে ফেলে।

পর্তুগীজ ম্যান-অব-ওয়ারের সরু ও নরম অঙ্গ এতই বিষাক্ত যে এদের সামান্য সংস্পর্শে এলেই বেশির ভাগ মাছ মারা যায়। তবুও কিন্তু **লেদার জ্যাকেট ফিশ** (Leather Jacket fish) ওই অঙ্গে ভেঙে খেয়ে ফেলে এবং মাছটির কোনো ক্ষতিই হয় না।

মাছেদের মধ্যে **ক্লিনার র‍্যাস** (Cleaner wrasse) হল ডাক্তার—সাধারণ রোগ আর

দাঁতের রোগের, ঠিক যেন ক্লিনার শ্রিম্পের মতোই। এরা পাথর বা প্রবালের ওপর বসে থাকে। অসুস্থ মাছেরা ডাক্তারখানায় আসে আর ইশারা করে বুঝিয়ে দেয় যে সাহায্য বা চিকিৎসার প্রয়োজন। ইশারা করার পদ্ধতি হল গায়ের রঙ পরিবর্তন করা বা মাথা নীচু করে লেজ ওপরে তুলে স্থির হয়ে দাঁড়ানো। ক্লিনার র‍্যাস রুগীর কাছে গিয়ে তার দেহ পরীক্ষা করে তাকে পরজীবি প্রাণীমুক্ত করে (কানকো ইত্যাদি থেকে)। এর জন্য প্রয়োজন বুঝলে সে অসুস্থ মাছের মুখের ভেতর ঢুকে যায়। তা ছাড়া রুগীর ক্ষতের চার পাশের দূষিত বা মরা চামড়া খুঁটে তোলে। ক্লিনার র‍্যাস যখন একটি রুগী নিয়ে ব্যস্ত, তখন বাকি রুগীরা শান্তভাবে নিজেদের পালা আসবার জন্য অপেক্ষা করে।
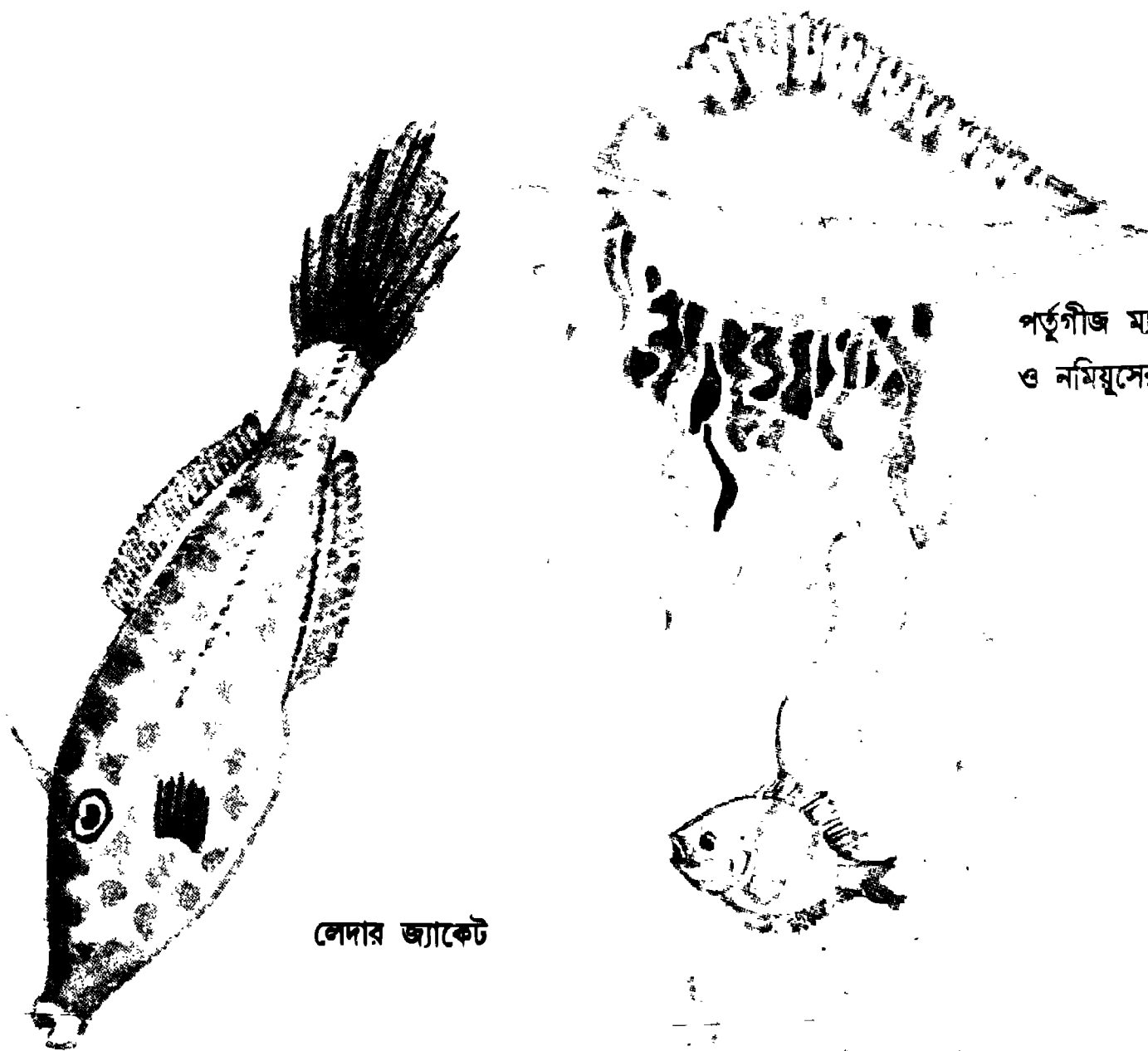
পর্তুগীজ ম্যান-অব-ওয়ার ও নমিয়ুসের সহাবস্থান

লেদার জ্যাকেট

এই মাছের সাহায্য নিয়েই মানুষ রোগের মোকাবিলাও করে। ম্যালেরিয়ার জীবাণু ছড়ায় মশা। মশার শূককীট বদ্ধ জলে বাস করে। গাপ্পিস (Guppies) আর গ্যাম্বুসিয়া (Gambusia) উত্তর আমেরিকার এক ধরনের মাছ ভারতে এদের চাষ হয় মশার বংশ বৃদ্ধি রোধে কারণ মশার শূককীট এদের প্রধান খাবার। এরা মশার শূককীট খেয়ে ফেলায় ম্যালেরিয়া ছড়ায় কম। এরা অন্য অনেক মাছ কোপিপড (Copipod) খায়। কোপিপডের শরীরে গিনি ওয়র্ম (Gninea worm) পরজীবী বাসা বাঁধে।

সে-সব মাছ গভীর সমুদ্রে বাস করে, তারা অনেকেই আলো ছড়ায়। আমরা যে টিউবলাইট বা বাল্ব ব্যবহার করি তা যথেষ্ট তড়িৎশক্তি অপচয় করে। কিন্তু এইসব মাছ (এবং অন্যান্য প্রাণী যেমন কোম্ব-জেলি, ওয়র্ম, বাগদা চিংড়ি, স্কুইড, সী স্কুইয়ার্ট—(Comb Jelly, Worm, Rawn, Squid, Sea squirt) ইত্যাদি খুবই চমকপ্রদ ভাবে তাদের আলো বিকিরণের ক্ষমতা বা শক্তি কাজে লাগায়। কিন্তু তাতে তাপ শক্তির উদ্ভব হয় না। তাই এই আলোকে বলা হয় শীতল আলো (Cold light)। যে সমস্ত মাছ এই ধরনের আলো বিকিরণ করে, তাদের বলা হয় ল্যান্টার্ন ফিশ (Lantern fish) বা আলোক মাছ। এদের শরীরে উজ্জ্বল আলোকবিন্দু সাজানো থাকে সারিবদ্ধভাবে। তবে এই সব আলোকবিন্দুর অবস্থান আর রঙ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন। এমন কি একই জাতের মাছের স্ত্রী এবং পুরুষের ক্ষেত্রেও আলাদা। সেই কারণেই স্ত্রী মাছটি অন্ধকারেও আলো দেখে বুঝতে পারে পুরুষ মাছটি এগোচ্ছে কিনা। পরিস্থিতি সঙ্গমের পক্ষে কতোটা অনুকূল।

কিছু কিছু মাছ নির্দিষ্ট বাসস্থানে থাকে। বাকিরা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়। এদের মধ্যে সামুদ্রিক মাছ (ওসিয়্যানিক টুনা (Oceanic tuna), মারলিন (Marlin), সাঁতারু মাছ বা সেইল ফিশ (Sail fish) আর অসিমাছ বা সোর্ড ফিশ (Sword fish) উল্লেখযোগ্য। এদের দেহ লম্বাটে, সরু গড়নের। এরা অত্যন্ত দ্রুত সাঁতার কাটতে পারে। স্তন্যপায়ী প্রাণী ছাড়া আর সমস্ত প্রাণীই শীতল রক্তের (Cold blooded), স্তন্যপায়ী জীবের দেহের তাপমাত্রা জ্বর হওয়া বা অসুস্থ হওয়া ছাড়া পরিবর্তিত হয় না)—এই সব মাছেদের দেহের তাপমাত্রা সমুদ্রের জলের তাপমাত্রা থেকে সাত আট ডিগ্রী বেশি।

অসিমাছ অত্যন্ত বদমেজাজী। কোন কারণ না থাকলেও এরা নৌকোর কাঠের পাটাতনে শক্ত লম্বা নাক দিয়ে ঘা মারে। অবশ্য তাতে ফল হয় এই যে পাটাতন ভেঙে নাক ঢুকে যায়। মাছ আর নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। অবশ্য অনেক সময় টানা-হেঁচড়া করে নাক ছাড়াতে পারে বটে, কিন্তু তাতে নিজেই সাংঘাতিক জখম হয়।

সাগর কুসুমের ভেতরে আশ্রয় নিয়েছে ক্লাউন ফিশ

সেইল ফিশ
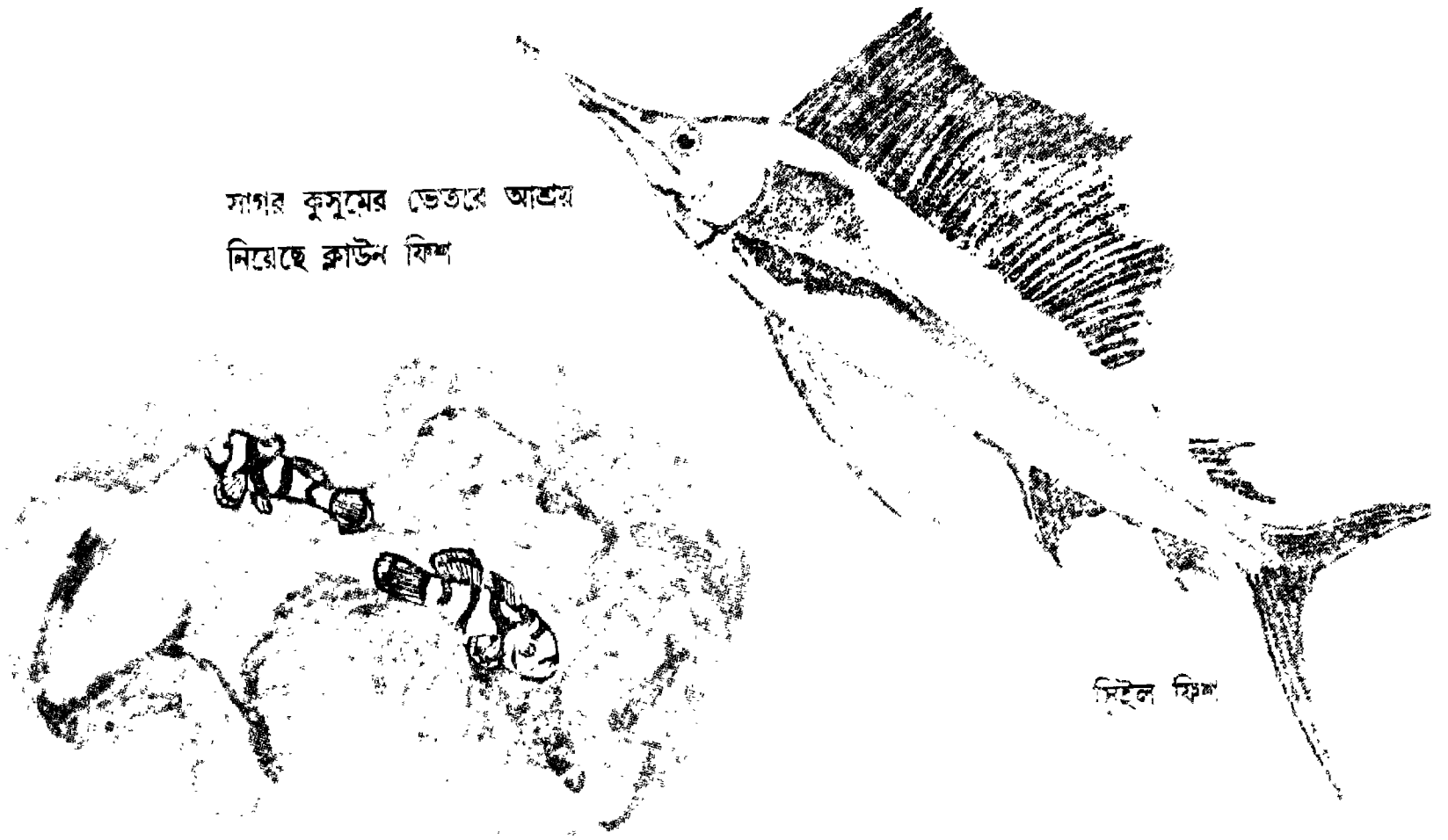
অনেক মাছের বন্ধু-বান্ধবের বাছাই বা পছন্দও বিচিত্র। সাগর কুসুম বা ক্লাউন মাছ (Clown fish) সাগর কুসুমকে আঁকড়ে বাসা বাঁধে। অথচ এই সাগর কুসুমের দেহের সরু ও নরম অংশে বিষাক্ত কোষ থাকে। এই বিষ কোনো মাছ বা প্রাণীর দেহে প্রবেশ করলে তার মৃত্যুও হতে পারে। কিন্তু ক্লাউন ফিশের বিষে কিছু হয় না। এরা সাগর কুসুমের (Sea anemone) কাছাকাছি থাকে, যেই শত্রু আক্রমণ করে, অমনই ছুটে এসে তাদের জাপটে ধরে।

শেপার্ড ফিশ (Sheppard fish)—নমিয়ুস (Nomeus) বন্ধু হিসেবে বেছে নিয়েছে আর একটি মারাত্মক প্রাণীকে, পর্তুগীজ ম্যান-অব-ওয়ার। এই বন্ধুটির দেহেও লম্বা সরু ও নরম অংশ আছে; যাতে বিষাক্ত কোষে ভর্তি। কিন্তু নমিয়ুস দিব্যি এর মধ্যে রাজার হালে কাটিয়ে দেয়। বন্ধুত্বের ঋণ পরিশোধ করতে নমিয়ুস অন্যান্য মাছকে প্রলুব্ধ করে ডেকে আনে। আর বিষক্রিয়ায় এরা মারা যায়। তখন পর্তুগীজ ম্যান-অব-ওয়ার এদের গিলে ফেলে।

রিমোরা (Remora) বা চোষক মাছ (Sucker fish) হাঙর আর কচ্ছপের বন্ধু। এই

মাছটির পিঠের পাখনা পরিবর্তিত হয়ে চোষকের (Sucker) আকার ধারণ করেছে। এটির সাহায্যে মাছটি হাঙর বা কচ্ছপের শরীরে আটকে থাকে এবং নিজের শক্তি বজায় রাখে। এই শোষক বা চোষকটির চোষণ ক্ষমতা (Suction) এত বেশি যে বড় একটি মাছ যদি সমুদ্রের জল ভর্তি বালতির ভেতর লেগে থাকে, তাহলে শুধুমাত্র তার লেজ ধরে টেনেই জলভরা বালতি তুলে আনা যায়। ভারতবর্ষের কোনো কোনো জায়গায় জেলেরা এই পদ্ধতিতে কচ্ছপ ধরে। এরকম একটি মাছ ধরে তার লেজে সুতো বেঁধে দেওয়া হয়। জেলে ডিঙিতে এই মাছটি নিয়ে সাগরে যায় আর কচ্ছপ নজরে পড়লে সুতো সমেত তাকে জলে ছেড়ে দেয়। সুতোর এক প্রান্ত থাকে জেলের হাতে। মাছ সাঁতার কেটে কচ্ছপের গায়ে আটকে যায়। তখন সুতো টেনে জেলে কচ্ছপটিকে ডিঙিতে তুলে নেয়। শত চেষ্টা করেও কচ্ছপ এর কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে না।

কাঁকড়া জাতীয় আর একটি মাছ আছে ক্যারাপাস (Carapus) এরা বাসা বাঁধে সী কিউকাম্বারের শরীরে। এদের দেহ সরু ও লম্বা। এটি সী কিউকাম্বারের লেজ ভেদ করে তার শরীরের ভেতরে প্রবেশ করে। আশ্রয়দাতার অবশ্য তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ব্যথা নেই।

কিন্তু কিছু কিছু মাছ আছে যা মানুষের পক্ষে খুব ক্ষতিকর। পাফার ফিশ (Puffer fish) তার মধ্যে অন্যতম। ভয় পেলে এরা জল বা বাতাস টেনে নিজের আয়তনের চার পাঁচ গুণ ফুলে যায়। তখন ভক্ষক একে গিলে ফেলতে পারে না। এর মাংস খাদ্য হিসেবে প্রচলিত। কিন্তু যকৃত, চামড়া, অন্ত্র আর ডিম অত্যন্ত বিষাক্ত। জাপানে বিশেষ ডিপ্লোমা প্রাপ্ত রাঁধুনী না থাকলে এই মাছ রেস্তোরাঁয় পরিবেশন করা আইনবিরুদ্ধ। পাচক সন্তর্পণে বিষাক্ত দেহাংশ আগে সরিয়ে নেয়। আমাদের দেশে জেলেদের জালে এই মাছ উঠলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়।
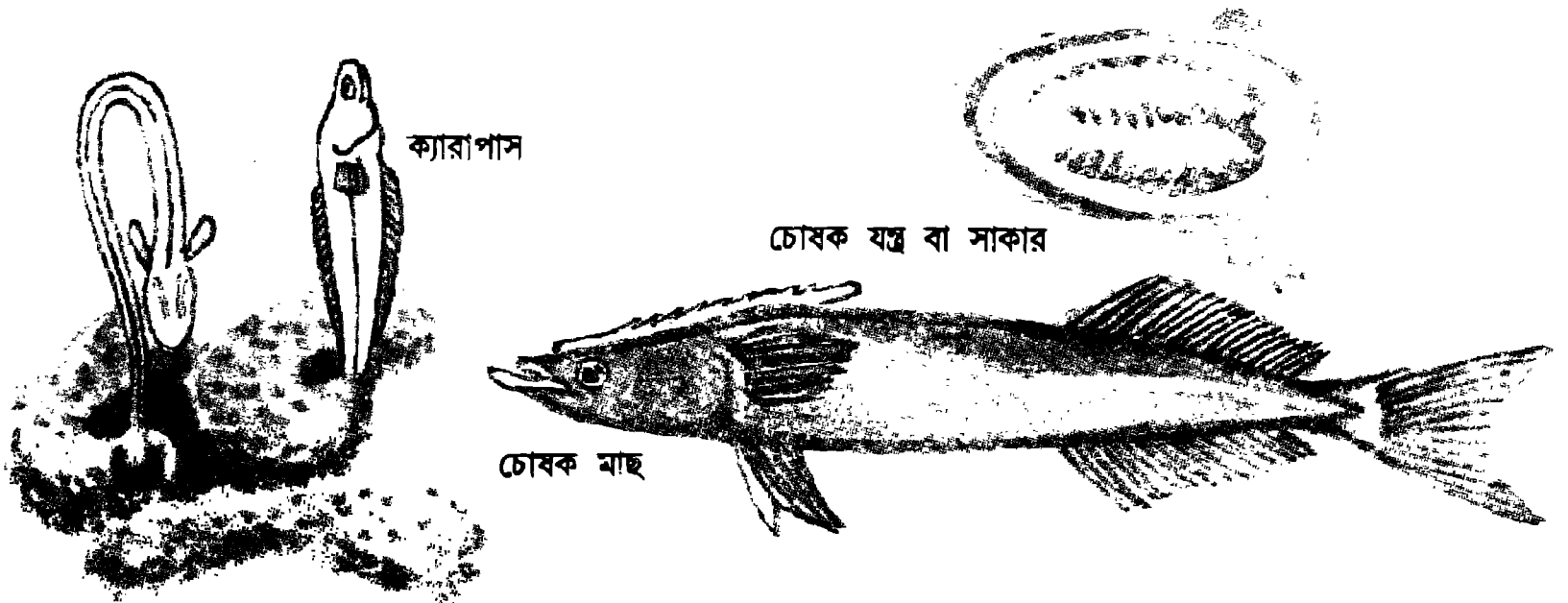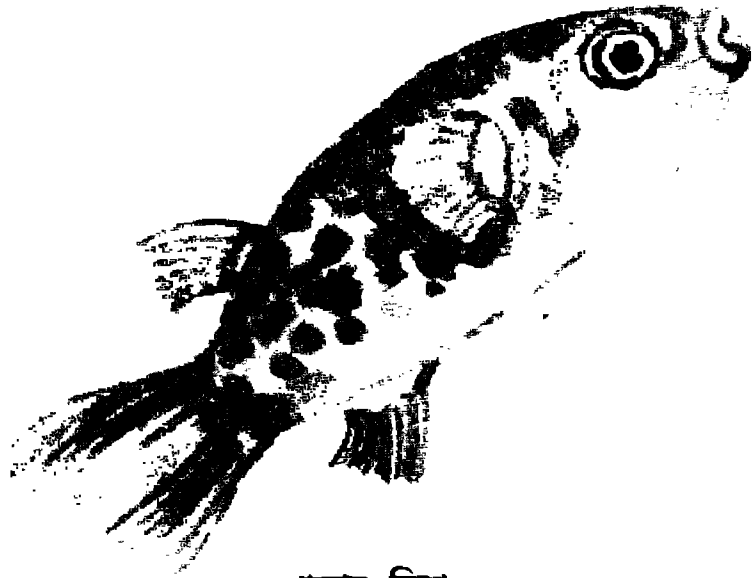
পাফার ফিশ

স্ফীতকায় পাফার ফিশ

যে সমস্ত মাছ প্রবাল প্রাচীরে বাস করে তারা সাধারণত খাদ্য হিসেবে গৃহীত হয়। কিন্তু কয়েকটি আবার বিষাক্ত। বিষ অবশ্য মাছ নিজে উৎপন্ন করে না। এরা যখন কিছু কিছু ছোট মাছ বা প্রাণী খায় (যেমন ডাইনো ফ্ল্যাজেলেট্স—Dyno flagellates) তখন ভক্ষ্য প্রাণীর দেহের বিষ এদের শরীরে প্রবেশ করে। মানুষ এই মাছ খেলে তার নানা রোগ দেখা যায়। এরকম মাছ খেলে দুর্বলতা, হাড়ের সন্ধিতে ব্যথা, দৃষ্টিতে অস্বচ্ছতা, মুহুর্মুহু বমি, আমাশয় ইত্যাদি রোগ হয়। এতে অনেক সময় পক্ষাঘাত ও তার ফলেও মৃত্যু পর্যন্ত বিচিত্র নয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া ঘটে। যেমন গরম চা পান করলে মনে হয় ঠান্ডা বরফের টুকরো চোষা হচ্ছে। ঠান্ডা আইসক্রীম বা ঠান্ডা জল যেন জিভ পুড়িয়ে দিচ্ছে। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি ঠান্ডা জলে স্নান পর্যন্ত করতে পারে না। অথচ এর কোন্ মাছ খাওয়া নিরাপদ, তা কোনো রাসায়নিক পরীক্ষা করে জানবার উপায় নেই। তবে ব্যারাকুডা (Barracuda) এই বিষ বহন করে বলে একে খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কিছু কিছু মাছ আছে যারা নিজেরাই বিষাক্ত। আমরা যদি বিশেষ কিছু খেয়ে বা পান করে অসুস্থ হয়ে পড়ি, তখন সেই খাবার বা পানীয়টিকে বিষাক্ত বলা হয়। যখন কিছু দূষিত পদার্থ রক্তে প্রবেশ করে, তখন রক্ত বিষিয়ে যায়। স্টিং রে-র হাড়টির কথা আগেই বলা হয়েছে। কিছু মাছের পাখনার শিরে বিষগ্রন্থি আছে। ক্যাট ফিশের পিঠ আর কাঁধের কাছের পাখনার শিরে বিষগ্রন্থি আছে। মরা ক্যাট ফিশের কাঁটার খোঁচাতেও রক্ত বিষিয়ে যায়। র‍্যাবিট ফিশ বা জিগ স'পাজ্‌ল ফিশের (Rabbit fish or Jigsaw puzzle fish) নিতম্বের দিকের কাঁটায় বিষগ্রন্থি আছে। টার্কি ফিশ (Turkey fish) ঠিক টার্কি বা বন
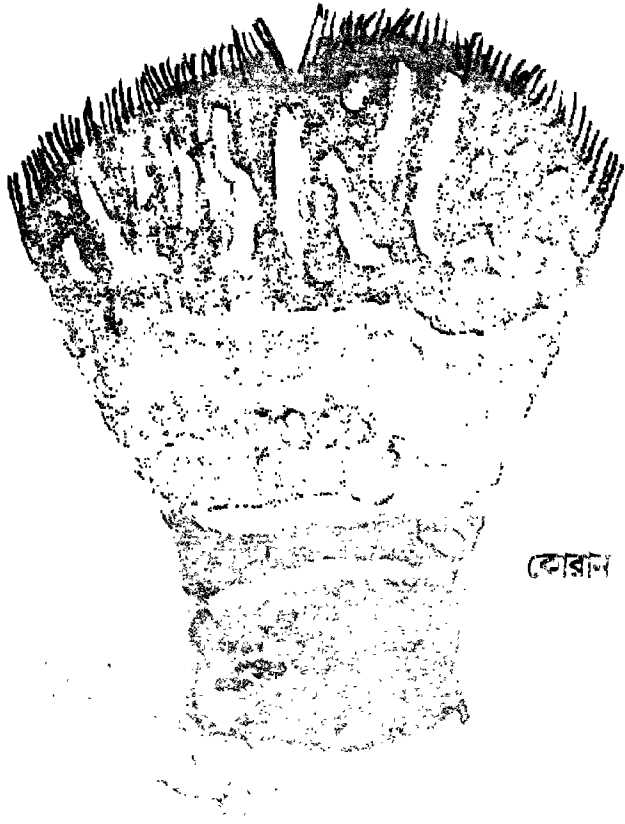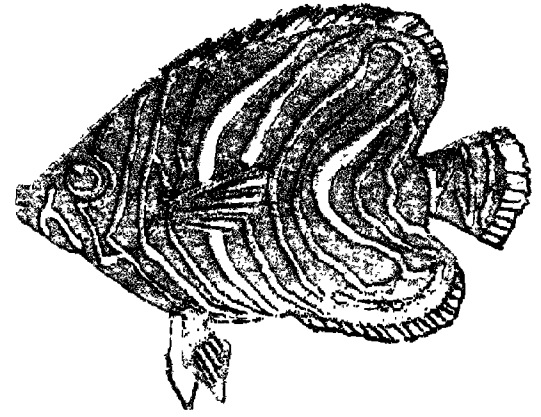
কোরান ফিশের লেজ
কোরান ফিশ
ক্যাটফিশের করোটি
স্টোন ফিশ
টার্কি ফিশ
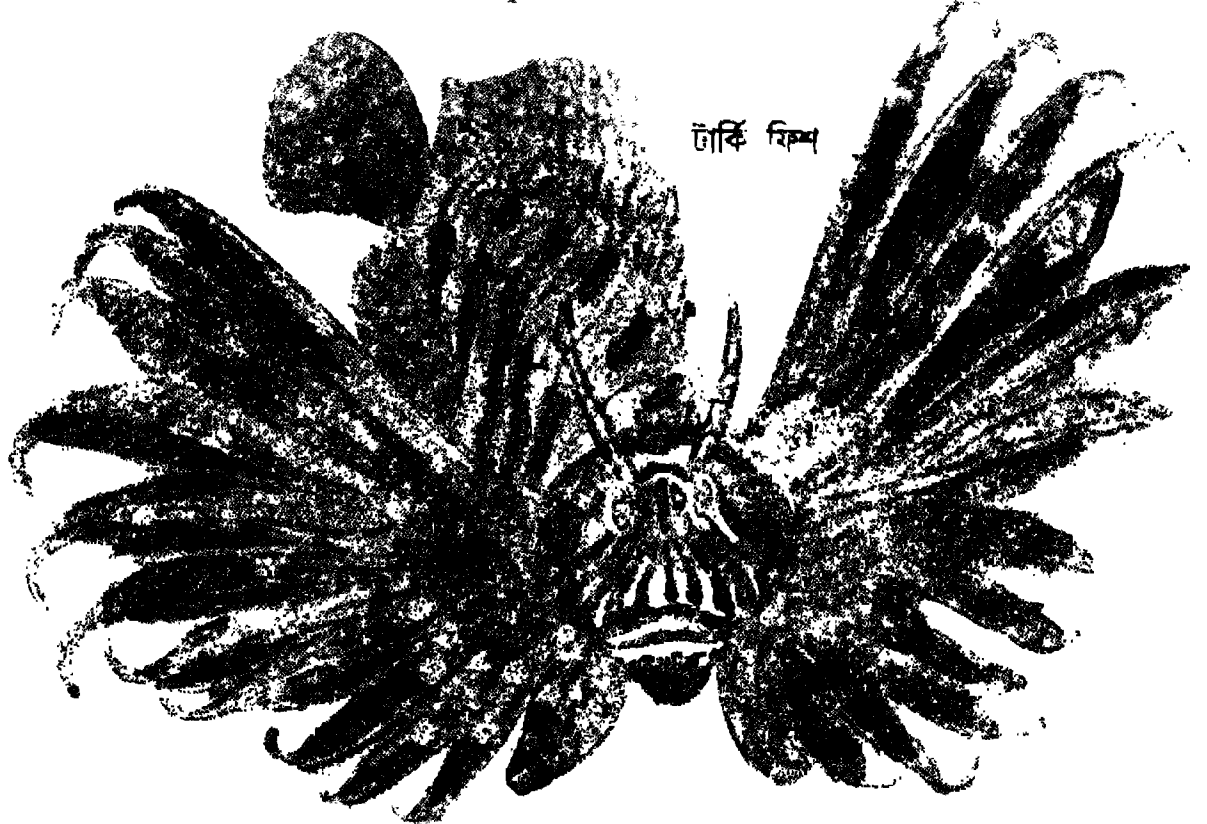
মোরগের মতোই আগুন-রঙা চিত্রবিচিত্র নক্সায় ভরা। এদের ঘাড়ের কাছে পাখির পালকের মতো নক্সা কাটা থাকে। এই নক্সার কাঁটা প্রয়োজন বোধে ফুলিয়ে এরা পাখার মতো ছড়িয়ে দেয় আর পিঠের শিরের কাঁটাটি ফুলে ওঠে। এই পিঠের শক্ত কাঁটার গোড়ায় আছে বিষগ্রন্থি; যখন খোঁচা লাগে ঠিক মনে হয় হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ দিয়ে ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে, ক্ষতস্থান বড় আকারের হলে তা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হয়। এমন কি হাসপাতালেও থাকতে হতে পারে। এই মাছকে লায়ন ফিসও (Lion fish) বলা হয়, কারণ ঘাড়ের কাছে নক্সা কাটা ঝালর দেখতে ঠিক যেন সিংহের কেশরের মতোই।

টার্কি মাছের সৌন্দর্য দেখে একটা প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক। এই সৌন্দর্যের উদ্দেশ্য বা সার্থকতা কী? প্রকৃতিতে প্রাণীদের রঙ্ পশ্চাদপটের সঙ্গে মানানসই থাকে, যাতে প্রয়োজনে প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গিয়ে এরা আত্মরক্ষা করতে পারে। যে-সব প্রাণী বিষ বহন করে বা স্বাদে বিশ্রী, তাদেরই দেখা যায় চকচকে ঝকঝকে চোখ ধাঁধানো রঙ্ আর উদ্ভট আকৃতি।

টার্কি মাছ যদি সুন্দর হয় তাহলে স্টোন ফিশ খুব কুৎসিত। কিন্তু এদের রঙ্ এমনই যে সমুদ্রের অগভীর অংশের তলদেশে যখন নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে, তখন একে না দেখে মাড়িয়ে দেওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু একবার সামান্যতম আহত হলেই এরা পাখনার বিষ ঢেলে দেয়। অনেক সময় এই বিষ মৃত্যু বাণের সামিল হয়ে দাঁড়ায়।

কিছু মাছ রঙ্ বা গঠন বৈচিত্র্যের জন্য পবিত্রতার প্রতীক। শিশু কোরান মাছের লেজে সাদা বিন্দু আর রেখার অসম আকারের নক্সা দেখা যায়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রেখাগুলি এমন হয় ঠিক যেন আরবী অক্ষরে 'শান্-এ-আল্লাহ্' (Shan-e-Allah—Glory of God) বা 'ঈশ্বরের অপর মহিমা' লেখা আছে বলে মনে হবে। মুসলমানেরা তাই এই মাছটিকে অত্যন্ত পবিত্র বলে মনে করে। ভালো করে নজর করলে দেখা যায় কিছু কিছু সামুদ্রিক ক্যাট ফিশের মাথার খুলির নীচের অংশ ঠিক ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মতো। এর শ্রবণেন্দ্রিয়ের কাঁটাগুলো যেন যীশুর মাথার চার পাশের জ্যোতি। আর খুলির ভেতরের সরু সরু কাঁটাগুলো যীশুর পোশাকের মতো।

সোনাব্যাঙ, কুনোব্যাঙ্ ও নিউট বা গোসাপ জাতীয় প্রাণী (Frogs, Toads & Newts)

সোনাব্যাঙ্ (Frog) আর কুনোব্যাঙ্ (Toad)—এই দুটি নামের সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। কিন্তু এদের ভেদ বিস্তর। এ সম্বন্ধে অনেকেই ওয়াকিবহাল নয়। দুই শ্রেণীর প্রাণীই লিপ্তপদ (চামড়া দিয়ে পেছনের পায়ের আঙুল পরস্পর সংযুক্ত—Webbed hind feet) আর এদের সামনের পা জোড়ার তুলনায় পেছনের পা জোড়া মোটা—যার ফলে এরা সহজেই লাফ

সোনাব্যাঙ

দিতে পারে। সোনাব্যাঙের চামড়া চকচকে, তুলতুলে। কোমরের কাছে সরু। আর কুনোব্যাঙের পিঠের কাছটি কুঁজের মতো, শরীর খসখসে, আঁচিলযুক্ত আর কোমরের কাছে চওড়া। সোনাব্যাঙের ওপরের চোয়ালে ছোট ছোট দাঁত আছে, কুনোব্যাঙের দাঁত নেই।

কুনোব্যাঙের মাথার দু-পাশে বা শরীরে একটি রস নিঃসরণকারী গ্রন্থি আছে—নির্গত, রসটি কটু আর বিষাক্ত। তাই অন্যান্য প্রাণী এদের চট করে আক্রমণ করে না। কুনোব্যাঙ সোনাব্যাঙের তুলনায় বেশি মাত্রায় স্থলচর। কিন্তু ডিম পাড়বার সময় জলে নেমে লম্বা মালার মতো গাঁথা ডিম পেড়ে যায়। সোনাব্যাঙ বেশির ভাগ সময়েই জলে বাস করে। এরা আলগা গাছের শিকড়ের ঝাড়ের গোড়ায় ডিম পাড়ে। কুঞ্চিত ব্যাঙ বা করু গেটেড ফ্রগ (Corrugated frog) সারাজীবন জলে বাস করে কাটিয়ে দেয়। সোনাব্যাঙ আর কুনোব্যাঙ ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়। এরা লেজবিহীন। এদের ডিম ফুটে যে ব্যাঙাচি (Tadpole) বা পলিওয়গ (Polywog) বের হয় তারা কানকোর সাহায্যে শ্বাস নেয়। এদের আবার লম্বা পাখনা বিশিষ্ট লেজ থাকে। তখন এদের দেখতে হয় অনেকটা মাছের মতো। এই জাতীয় ব্যাঙের দেহে প্রথমে কোনো পা জাতীয় প্রত্যঙ্গ (Limb) থাকে না। তারপর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পা গজায় আর লেজ ছোট হতে হতে মিলিয়ে যায়। ব্যাঙাচি নিরামিষাশী এবং এদের অন্ত্র লম্বা আর পাকানো। অন্ত্রের শেষ ভাগ কুনোব্যাঙের ক্ষেত্রে শরীরের মাঝামাঝি আর সোনাব্যাঙের ক্ষেত্রে শরীরের মাঝামাঝি অংশের সামান্য ডানদিকে থাকে।

সোনাব্যাঙ খায় কীটপতঙ্গ, মিঠে জলের কাঁকড়া, ছোট মাছ। এরই জন্য এরা কৃষকদের বন্ধু। কারণ জমি থেকে অবাঞ্ছিত কীটপতঙ্গ ইত্যাদি দূর করার কাজে ওরা চাষীদের সাহায্য করে।
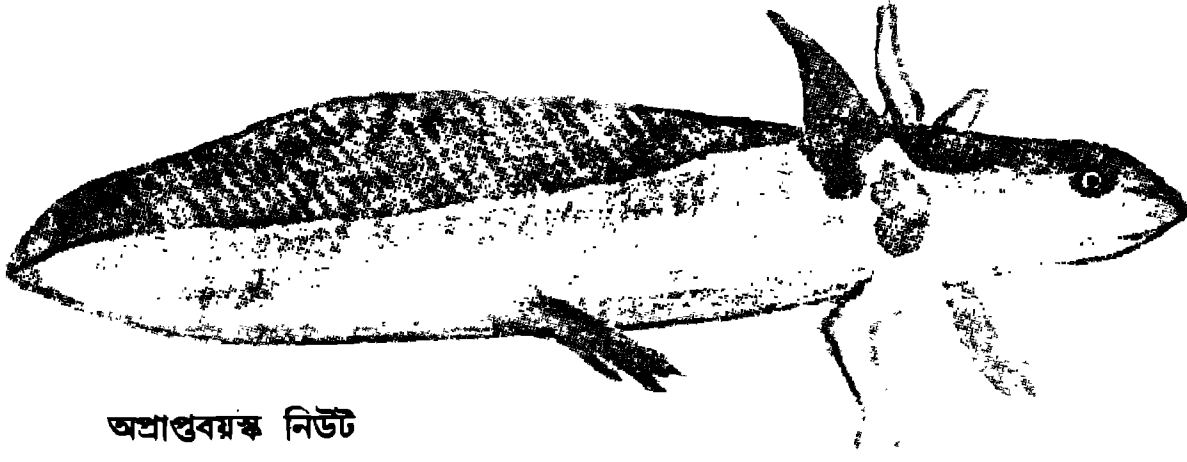
অপ্রাপ্তবয়স্ক নিউট

বন্ধু। কারণ জমি থেকে অবাঞ্ছিত কীটপতঙ্গ ইত্যাদি দূর করার কাজে ওরা চাষীদের সাহায্য করে।

গোসাপ-জাতীয় প্রাণী বা নিউট (Newt) এক শ্রেণীর উভচর (বা অ্যাম্ফিবিয়ান)। দেখতে ঠিক সরীসৃপের মতো, এদের দেহ নরম, আঁশবিহীন। পায়ে কোন থাবা থাকে না। ভারতবর্ষের পূর্ব হিমালয় অঞ্চলে দার্জিলিং ও সিকিমে এধরনের প্রাণী দেখতে পাওয়া যায়। এগুলি দেখতে খুবই সাধারণ। রঙ্ কালচে বাদামী, পেটের কাছে হালকা হলুদ বা কমলা ডোরাকাটা। এরা লম্বায় 15 সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়। উত্তেজিত হলেই এরা বিষাক্ত আঠালো রস বার করতে থাকে।

সাপ, কুমীর আর জলচর কচ্ছপের কথা (Snakes, Crocodiles and Turtles)

এই তিন প্রাণীই সরীসৃপ। শ্বাস-প্রশ্বাস নেয় ফুসফুসের সাহায্যে। বেশির ভাগ সাপই ডাঙায় বাস করে; কিছু সাপ জলে ; মিঠে জলের সাপ সাধারণত নির্বিষ। কিন্তু সামুদ্রিক সাপ অত্যন্ত বিষাক্ত। এই সামুদ্রিক সাপের বিষ স্থলচর সাপের বিষের চেয়েও সাংঘাতিক। এটি স্নায়ু অসাড় করে দেয়। অবশ্য ভরসার কথা এই যে সামুদ্রিক সাপ সাধারণত হিংস্র হয় না এবং অত্যন্ত

সামুদ্রিক সাপ

বিরক্ত না হলে বা ভয় না পেলে দংশন করে না। এরা অনেক সময় মাছ ধরার জালের সঙ্গে জড়িয়ে যায় ; জেলেরা নির্ভয়ে এদের মুক্ত করে সাগরে ফেলে। সাঁতার কাটবার সুবিধার জন্য এদের লেজের গড়ন চ্যাপটা। সামুদ্রিক সাপ (Sea Snake) বাতাসে শ্বাস-প্রশ্বাস নিলেও প্রয়োজনে তিন ঘন্টারও বেশি জলে সম্পূর্ণ ডুবে থাকতে পারে। সামুদ্রিক সাপের সী ক্রেইট (Sea Krait) ডাঙায় উঠে এসে ডিম পাড়ে। একমাত্র এই সাপটি ছাড়া যাবতীয় সমুদ্রের সাপ জরায়ুজ (Viviparous) অর্থাৎ এরা সরাসরি সন্তানের জন্ম দেয়, ডিম পাড়ে না।

কুমীরকে দেখতে অনেকটা অতিকায় সরীসৃপের মতো। সবচেয়ে পরিচিত হল জলার কুমীর (Marsh Crocodile) বা মাগার (Mugger) লম্বায় 3.5 মিটার। এরা মাছ, ছোট কচ্ছপ, কাঁকড়া, সামুদ্রিক বা জলার পাখি যেমন করমোরান্ট (Cormorant— এক ধরনের লিপ্তপদ সামুদ্রিক পাখি) আর ছোট স্তন্যপায়ী জীব (যেমন উদ্‌বিড়াল বা ভোঁদড় —Otters) খায়। এরা চলে পেট মাটিতে ঘষে ঘষে। কখনও কখনও বা পা সামান্য তুলে হেঁটেও যায়। শক্ত লেজের ঝাপটানি দিয়ে এরা অনায়াসে সাঁতার কাটে। রোদ পোহাতে এই কুমীরের ভয়ানক উৎসাহ। হাঁ করে মুখ খুলে (যাতে শরীরের তাপমাত্রা ঠিক থাকে) ঠায় শুয়ে থাকে রোদে। এদের আয়ু সাধারণত একশো বছরেরও বেশি। যদিও বাতাসে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়, তবুও দরকার মতো ঘন্টার পর ঘন্টা এরা জলে ডুবে থাকতে পারে, শুধু প্রতি ঘন্টায় বেশ কয়েকবার উঠে বাইরের বাতাস টেনে নেয়। মা কুমীর জলা বা নদীর তীরে গর্ত খুঁড়ে একসঙ্গে পঞ্চাশটি পর্যন্ত ডিম পাড়ে। মাস দুয়েক পর ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। তখন

কুমীর
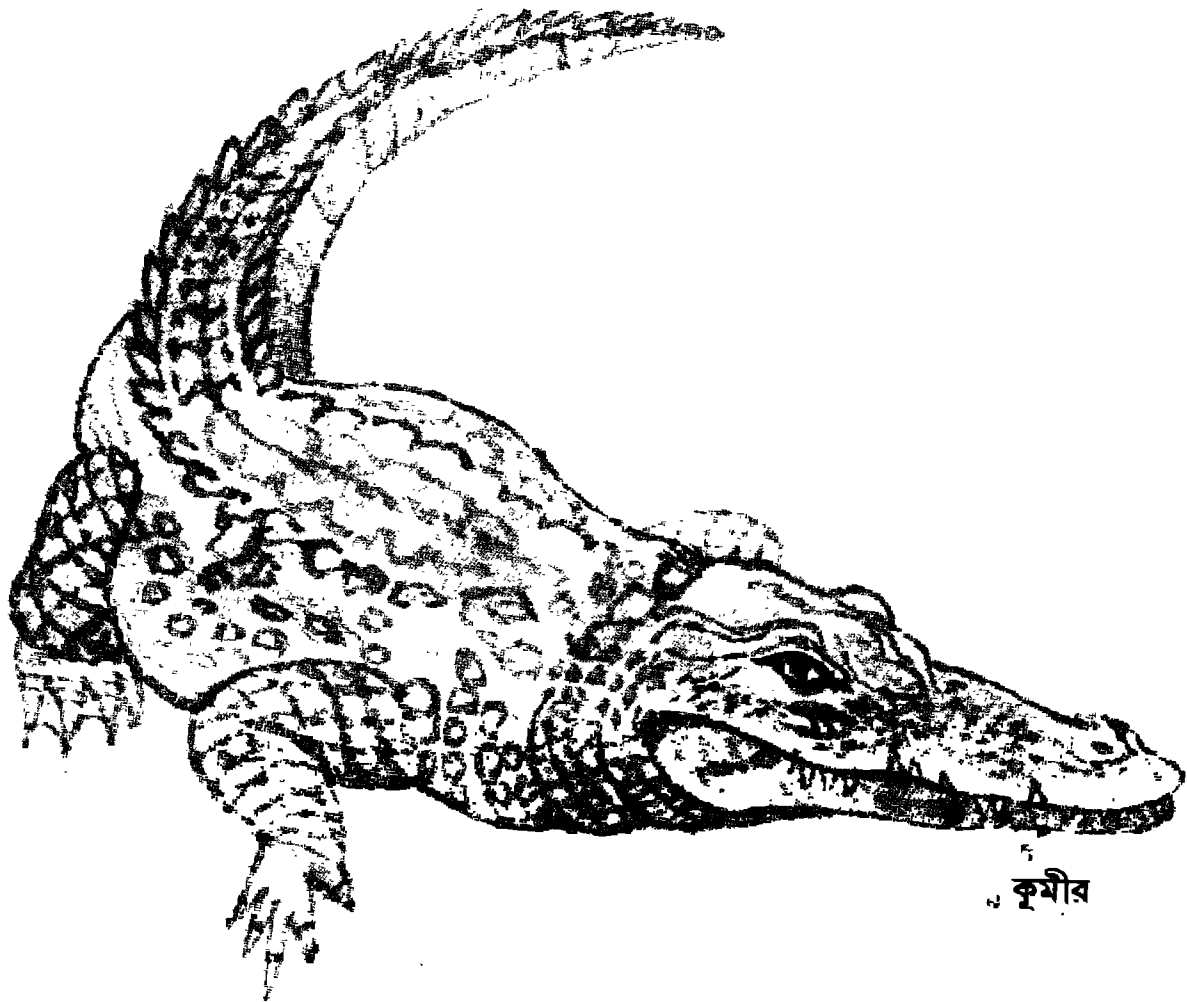
এরা মাটির ভেতর থেকে মৃদু গুম গুম শব্দ করতে থাকে। মা কুমীর তখন তাড়াতাড়ি তাদের মাটি খুঁড়ে বের করে মুখে নিয়ে জলের দিকে চলে যায়। জন্মের সময় বাচ্চার হয় মাত্র 25 সেন্টিমিটার লম্বা। তখন এরা এতই অসহায় যে সহজেই অন্যান্য সাপ, শৃগাল আর শুয়োরের দল এদের খেয়ে ফেলে। তাই মা কুমীরের নিরাপদ আশ্রয়ে এরা আরও কয়েক সপ্তাহ কাটিয়ে দেয়। এই সময় এদের খাবার হল কীটপতঙ্গ, ব্যাঙ, মাছ ও ছোট ছোট সাপ। জলার কুমীর সমাজবদ্ধ জীব, এরা কুড়ি থেকে তিরিশটি এক সঙ্গে ঝাঁক বেঁধে বাস করে। মা কুমীর নিজের ডিম আর সন্তানদের রক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত তৎপর এবং সেই অবস্থায় এরা মানুষকে আক্রমণ করতেও দ্বিধা করে না।

নোনা জলের কুমীর আকারে বড়, লম্বায় প্রায় 8 মিটার পর্যন্ত। তবে এদের দেহ অপেক্ষাকৃত সরু আর মাথা লম্বা এবং সূচালো। এরা জলার কুমীরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম সামাজিক। গ্রীষ্মকালে মা কুমীর এক মিটার উঁচু আর দুই মিটার চওড়া মাটি আর লতা পাতার স্তূপ বানিয়ে তার ভেতর এক সঙ্গে নব্বইটি পর্যন্ত ডিম পাড়ে। 75 থেকে 80 দিনের মাথায় ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। মা কুমীর তখন বাচ্চাদের বের করে জলে নিয়ে যায়। শিশু অবস্থায় এরা গাঢ় হলুদ আর কালো রঙের। পূর্ণাঙ্গ কুমীর মাছ, কাঁকড়া, সরীসৃপ, হরিণ, শুয়োর খায়। খুব বড় আকারের যে-সব কুমীর তারা কিন্তু মানুষ খেকোও।

ঘড়িয়াল (Gharial) এক রকম জলার কুমীর, ভারতবর্ষে এদের দেখতে পাওয়া যায়। লম্বায় এরা 7 মিটার পর্যন্ত হয়। পুরুষ ঘড়িয়ালের লম্বা নাকের ডগায় অত্যন্ত প্রকট ঢিবির মতো অংশ আছে—যা দেখতে অনেকটা ঘড়ার মতো। তাই এদের নাম ঘড়িয়াল। এরা মাছ খেতে ভালোবাসে। ঘড়িয়ালের চোয়াল লম্বা, সরু ; চোখ বাইরে বেরিয়ে আসা ড্যাবডেবে। গায়ের রঙ্ জলপাই সবুজ। মার্চ মাসে গর্ত খুঁড়ে এরা 40 থেকে 80টি ডিম পাড়ে। জুন মাস নাগাদ ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। এক একটি দলে একটি পুরুষ, একাধিক স্ত্রী-জাতীয় কুমীর আর বেশ কিছু আধা পূর্ণাঙ্গ ঘড়িয়াল একসঙ্গে থাকে।
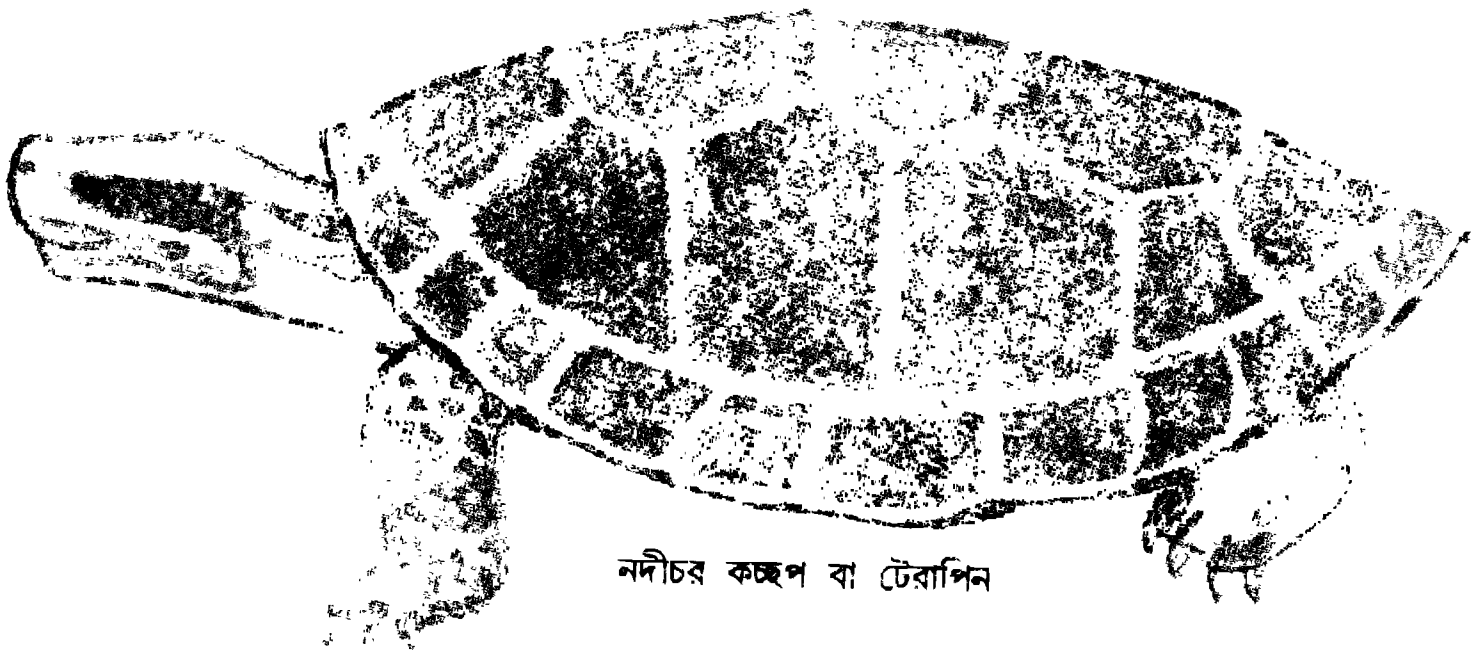
নদীচর কচ্ছপ বা টেরাপিন

কাছিম বা কচ্ছপ (টার্টল) আসলে হল জলচর। ফুসফুসই এদের শ্বাসযন্ত্র। কাছিমের দেহ অপেক্ষাকৃত চ্যাপটা ধরনের এবং এরা লিপ্তপাদ। অর্থাৎ পায়ের আঙুল সব-সময় সংযুক্ত। সম্পূর্ণ শরীর শক্ত আবরণ বা খোলে ঢাকা। শুধু মুখ, পা আর লেজের জায়গায় খোলে ফুটো আছে। কচ্ছপ নানান জাতের।

নদীচর কচ্ছপ (টেরাপিন)। দিনের বেলায় এরা জলে থাকে, কিন্তু রাতে জল থেকে ডাঙায় উঠে আসে। এরা আমিষ, নিরামিষ দুরকম খাবারই খায়, তবে নিরামিষই পছন্দ করে বেশি। এ-জাতের স্ত্রী কচ্ছপ ডিমের মতো সাদা, ভঙ্গুর ডিম পাড়ে। এদের বেশির ভাগই উজ্জ্বল রঙের তাঁবুর আকারের কাছিম এদের মাথায় লাল বিন্দু থাকে। এদেরকে অনেকেই পোষে। বাক্সের মতো দেখতে কচ্ছপ বা বক্স টার্টল (Box Turtle) দেখতে পাওয়া যায় আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। এদের নীচের দিকে খোলটি কবজার মতো জোড়ের সাহায্যে দুটি পৃথক ঢাকনির মতো অংশে ভাগ করা। এই অংশ দুটি সরানো যায়। নদীচর কচ্ছপের বালাগুরের (Balagur) পুরুষটি লম্বায় প্রায় 50 সেন্টিমিটার হতে পারে, স্ত্রী কচ্ছপ পুরুষের তুলনায় আকারে তিনগুণ বড়। নরম খোলের কচ্ছপের দেহে খোলের ওপর চামড়ার আবরণ থাকে। এই কচ্ছপের ঘাড় নরম, লম্বা। এরা জোরে কামড়ে ধরতে পারে। বিষ্ণুর দশাবতারের একটি অবতার হিসেবে এরা মন্দিরে স্থান করে নিয়েছে।

সামুদ্রিক কচ্ছপের পায়ে চ্যাপটা দাঁড়ের মতো অংশ আছে, যাতে দ্রুত সাঁতার কাটবার সুবিধে হয়। এরা প্রায় সমস্ত জীবনটাই সমুদ্রের জলে কাটিয়ে দেয়। একমাত্র স্ত্রী সামুদ্রিক কচ্ছপ ডাঙায় উঠে এসে ডিম পাড়ে। রাতের অন্ধকারে বালি খুঁড়ে 50 থেকে 200টি ডিম প্রসব করে। এগুলি গোলাকার টেনিস বলের মাপের, ওপরের খোলস কাগজের মতো পাতলা। মা কচ্ছপ স্থলে থাকাকালীন সমানে অশ্রু বিসর্জন করে, যাতে চোখের ভেতরটা শুকিয়ে না যায় বা বালি না ঢোকে। মাস দুই পর ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয় আর তারা সমুদ্রে চলে যায়। যদি আবহাওয়া এমন হয় যে তাপমাত্রা খুবই কম, তাহলে ডিম ফুটে যে শিশু বের হয়, তারা সবই পুরুষ ; যদি তাপমাত্রা খুব বেশি হয় তাহলে সবগুলি স্ত্রী আর একেবারে সঠিক ও উপযোগী তাপমাত্রায় শিশুগুলি স্ত্রী ও পুরুষ দুই ধরনেরই হয়, যারা সংখ্যায় প্রায় সমান সমান। একই ভাবে এই তাপমাত্রাই কুমীরের ক্ষেত্রেও লিঙ্গ নির্ধারক। অলিভ রিডলে (Olive Ridley Turtle) দেখা যায় ওড়িশায়। এদের ডিম পাড়বার পর্বটি অদ্ভুত। ফেব্রুয়ারি মাসে সমুদ্র তটের প্রায় 10 কিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে প্রায় 200,000 (2 লক্ষ) স্ত্রী কচ্ছপ পনেরো দিন ধরে ডিম পাড়তে থাকে।

স্তন্যপায়ী জীব (Mammals) : এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে উদ্‌বিড়াল বা ভোঁদড়। এদের দেহ বেজির মতো লম্বাটে গড়নের। কিন্তু লেজ চওড়া। পায়ের আঙুলগুলো পাতলা চামড়া

ডলফিন্

দিয়ে পুরস্পর সংযুক্ত, যাতে সাঁতার কাটবার সুবিধা হয়। এই প্রাণীটি অত্যন্ত দক্ষ সাঁতারু। দরকার মতো যে-কোনো সময় এঁকে বেঁকে ঘুরে গিয়ে মাছ আর জলচর পাখি ধরে খেতে পারে। এদের দেহ ছোট ছোট ভেলভেটের মতো মসৃণ রোমে ঢাকা। এই রোম বাতাসকে বদ্ধ রাখে, এবং প্রাণীটির দেহকে জলের ভেতর গরম রাখতে সাহায্য করে। উদবিড়াল যখন জলে ডুব দেয়, তখন তার নাকের ছিদ্র আর কান বন্ধ করে রাখতে পারে। এই প্রাণীটি লেজসমেত 100 সেন্টিমিটার। শিশু অবস্থায় এরা অন্ধ আর অসহায় থাকে। নদীর তীরে গর্ত খুঁড়ে উদ্‌বিড়াল সন্তান প্রসব করে। ওড়িশার জেলেরা এদের পোষ মানিযে নেয়, জালে মাছ সহজে আসার জন্য কাজে লাগায়।

ডলফিন (Dolphin) আর শুশুক (Porpoise) অনেকটা মাছেরই মতো, তবে মাছের লেজের পাখনা খাড়াভাবে থাকে (Vertical)। কিন্তু এদের লেজের অবস্থান অনুভূমিক (Horizontal)। এদের দেহের দু-পাশে ডানার মতো যে প্রত্যঙ্গটি থাকে, তার গঠন আমাদের হাতের মতো। ডলফিনের নাক পাখির ঠোঁটের মতো লম্বা, আর শুশুকের নাক গোল ও ভোঁতা। এই দুটি প্রাণীই স্তন্যপায়ী। এরা মাথার ওপর অবস্থিত একটি ছিদ্র দিয়ে বাইরের বাতাস গ্রহণ করে শ্বাসক্রিয়া চালায়। জলের উপরিতলে ভেসে উঠে এরা বাতাস টেনে নেয়, তারপর ব্যবহৃত গরম বায়ু ফুসফুসের ভেতর থেকে বের করে ওই ছিদ্রপথেই বাইরে বার করে দেয়।

ভারতীয় ডলফিনের আস্তানা হল অগভীর সমুদ্র। এরা লম্বায় 2·75 মিটার পর্যন্ত হয়। পিঠের রঙ্ বেগুনী-ধূসর মেশানো, পেট সাদা। প্রধান খাদ্য হল মাছ আর স্কুইড। এক একটি দলে দুই থেকে ছয়টি ডলফিন থাকে। এদের পিঠে একটি পাখনা আছে। পাখনাহীন কালো শুশুক আকারে ছোট, দৈর্ঘ্যে 1·5 মিটার পর্যন্ত হয় আর কাঠের গোঁজের (Peglike) মতো দাঁত থাকে।

ডলফিন নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করে শব্দ সংকেত পাঠিয়ে। এরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান। বলা হয় এদের নিজস্ব ভাষা আছে। আর সবচেয়ে বড় কথা হল এই শব্দের অনুরণন সমুদ্রে স্থান নির্ণয়ে বা প্রতিধ্বনির উৎস নির্ণয়ে সাহায্য করে। ডলফিন শব্দ-তরঙ্গ পাঠায়, এই তরঙ্গ কোনো বস্তুতে আঘাত করে, অনুরণিত হয়ে শব্দ-তরঙ্গ আগের জায়গায় ফিরে আসে, তবে ডলফিনের 'কানে' নয়, চোয়ালে আর গলায়। এই প্রতিধ্বনি থেকে ডলফিন ওই নির্দিষ্ট বস্তুটির আকার, গঠন, সেটির গতিবেগ থাকলে তা মোটামুটি কত, তার দিক, বস্তুটির অবস্থান বা দূরত্ব নির্ণয় করতে পারে। এই অদ্ভুত ক্ষমতার সাহায্যে ডলফিন সমুদ্রে থাকাকালীন অবাঞ্ছিত আঘাত থেকে আত্মরক্ষা করে আর শিকার ধরতে সক্ষম হয়।

সমুদ্রের সুন্দরদেহী ডলফিনের তুলনায় গাঙ্গেয় শুশুক বা শুশু (Susu) [যা গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্র, তাদের উপনদীতে পাওয়া যায়] এরা কুৎসিত দেখতে। এদের রঙ্ ঝুলের মতো কালো। চামড়া ঢিলে, পিঠে কুঁজের মতো অংশ আছে, চোখ গোল গোল, ঘাড় ছোট আর লম্বা নাক। এরা দৃষ্টিহীন কিন্তু ডলফিনের মতো এদেরও প্রতিধ্বনির উৎস নির্ণয়ের ক্ষমতা আছে। দিনের বেলায় এরা গভীর জলে থাকে, রাতে নদীর অগভীর অংশে (জল যেখানে সেন্টিমিটার গভীর মাত্র) এসে চিংড়ি বা অন্য মাছ শিকার করে। এরা শরীর একদিকে হেলিয়ে শিকার ধরে। তার জন্য সহায়ক হয় দাঁড়ের বা বৈঠার মতো প্রত্যঙ্গ আর আধখানা লেজ—যেগুলি জলের ওপর থাকে। এরা লম্বায় মিটার পর্যন্ত হয়। এপ্রিল থেকে জুলাই এদের সন্তান প্রসবের সময়। এগুলি এখন অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য প্রাণী, হয়তো বা ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে।

ডুগং (Dugung) বা **সমুদ্রে গরু** (Sea Cow) লম্বায় তিন মিটার, ওজনে 400

ডুগং

কিলোগ্রাম হয়। এরা সামুদ্রিক লতাপাতা খায়। মান্নার, কচ্ছ আর আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের স্থলবেষ্টিত উপসাগরীয় অঞ্চলে এদের বসতি। এই জীবটির ওপরের ঠোঁট ঘোড়ার ক্ষুরের আকারের, মাংসল, নীচের ঠোঁটের ওপর ঝুলে পড়েছে, তাতে রয়েছে শক্ত রোম। পুরুষ ডুগং-এর ওপরের ঠোঁটে লম্বা দাঁত আছে। এদের চোখ ছোট, গোল পুঁতির মতো। স্ত্রী ডুগং-এর স্তন থাকে বক্ষদেশে, বৈঠার মতো দুটি প্রত্যঙ্গের মাঝে। শিশুদের স্তন্যপানের সময় মা ডুগং ওই বৈঠার মতো একটি প্রত্যঙ্গ দিয়ে সন্তানকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে থাকে। এদের দেখেই প্রথম জলকন্যা বা মারমেইডদের কাহিনী প্রচলিত হয়। মাথার ওপরে আছে নাকের ছিদ্র। প্রতি আধ মিনিট থেকে আট মিনিটের মধ্যবর্তী সময়ে একবার করে জলের ওপর ভেসে ওঠে ডুগং শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য প্রয়োজনীয় বাতাস গ্রহণ করে।

মাছের ভ্রাম্যমান বা প্রচরণশীল স্বভাবের কথা (Fish Migration)

কিছু কিছু মাছ আছে যেমন হাঙর ও টুনা, এরা সমুদ্রের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ঘোরাফেরা করে। কিন্তু এদের ভ্রাম্যমান মাছ বা প্রচরণশীল মাছ (Migratory fish) বলা যায় না। ভ্রাম্যমান জীব এক জায়গা থেকে আর একটি নির্দিষ্ট জায়গায় যায়, আবার কিছুদিন পর আগেকার জায়গায় ফিরে আসে। সাধারণত বংশবৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই মাছ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যায়।

এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল ঈল (Eel)। অপ্রাপ্তবয়স্ক ঈল নদীতে বড় হয়, তারপর পূর্ণতা প্রাপ্তির পর এরা সাগরে চলে যায়। ডিম পাড়বার জন্য ঈলের পছন্দসই জায়গা হল গভীর সমুদ্র। ঈল শাবককে বলা হয় এলভার (Elver)। গভীর সমুদ্রে ডিম ফুটে এদের বাচ্চা বের হয়। ডিমের চেহারা স্বচ্ছ আর পাতার মতো। শিশু অবস্থায় এরা নলের মতো দেখতে হয়। তখন সাঁতার কেটে ডাঙার দিকে যায়, নদীতেই এরা বড় হয়। ইউরোপ আর আমেরিকার পূর্ব উপকূলের ঈলরা বংশবৃদ্ধি করে সারগাসো সমুদ্রে। এই ডিম ফুটে যে বাচ্চা বের হয়, নদীর সন্ধানে তাদের বেশ কয়েকশ' কিলোমিটার সাঁতার দিতে হয়। ভারতবর্ষের ঈল ইউরোপ আর আমেরিকার ঈলেরই জাতভাই, তবে এরা কোথায় যে বংশবৃদ্ধি করে তা এখনও জানা যায় নি।

রোহিত জাতীয় মাছ (Somon) নদী বা মিঠে জলের স্রোতে ডিম পাড়ে। অনেক প্রজাতিতে সঙ্গম ও ডিম প্রসব করার পরই পূর্ণাঙ্গ প্রাণীটি মারা যায়। জন্মের পর কিছু সময় শিশু মাছ নদীতে থাকে। তারপর বড় হলে সাগরে ফিরে যায়। সাগরে বেশ কয়েক বছর থাকবার পর আবার তটের দিকে ফিরে আসে। তখন এরা ছোটে সেই পুরনো

নদীর পুরনো পরিবেশে। নদীটিকে খুঁজে বের করার পর এরা সেই অগভীর নদীতেই সঙ্গমে লিপ্ত হয়। মনে হবে, জলের গন্ধ এরা কিন্তু চিনতে পারে। ভারতীয় শাড (Shed) বা ইলিশ মাছ (Hilsa) রোহিত মাছের মতো। এরাও সমুদ্রে থাকে কিন্তু ডিম পাড়বার সময় উজান বেয়ে নদীতে আসে।

তিমি মাছও (Whale) এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘোরে। এরা শীতল মেরু অঞ্চলের সাগরে থাকে। কিন্তু বংশবৃদ্ধির জন্য নির্বাচন করে উষ্ণ অঞ্চল।

মানুষ এবং তার আশেপাশের জলের পরিবেশ (Man and his Aquatic Cnvironment)
পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে গাছপালা, পশু পাখির সহাবস্থান। আমাদের দেশে বহু পৌরাণিক কাহিনী ও লোককথা এই প্রকৃতি ও তার সদস্যদের নিয়ে গড়ে উঠেছে। প্রথমে পৃথিবীতে ছিল শুধু জল, তারপর তাতে ধীরে ধীরে প্রাণের সন্ধান দেখা দিল। মাছ, পাখি, উভচর প্রাণী, এমন কি সরীসৃপ ইত্যাদি সবই লোকগাথায় স্থান পেয়েছে। বহু কাহিনীর লেখকের পরিচয় আজ মুছে গেছে। কিন্তু কাহিনীগুলো আর তা থেকে যে মৌলিক শিক্ষা পাওয়া গেছে, তা আজও অমলিন। যে-সব গল্পে সাপের কাহিনী আছে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তারা হিংস্র বা বিষাক্ত নয়, বুদ্ধিমান ও সুন্দর। পাখি স্বর্গের দূত। মাছের কাহিনী আমাদের শিখিয়েছে জীবনসংগ্রাম আর তাতে টিকে থাকবার উপায়। উপন্যাসে 'মৎস্য' বা মাছ হল একটি ছোট মাছ, বেঁচে থাকবার জন্য যাকে অবিরাম যুদ্ধ করে যেতে হচ্ছে। কারণ সামান্য অসতর্ক হলেই বড় মাছ তাকে খেয়ে ফেলবে। কিন্তু ছোট মাছটির উপস্থিত বুদ্ধিই মৃত্যুর কবল থেকে তাকে বাঁচায়। মানুষ তাকে আশ্রয় দেয় (মনুই সেই আদি মানব)। মৎস্য আসলে বিষ্ণুদেবতারই এক রূপ বা অবতার, পৃথিবী যখন ধ্বংসের মুখে, তখন বিষ্ণুই তাঁর একদা আশ্রয়দাতা মনু ও আশ্রয়স্থল পৃথিবীকে রক্ষা করেন।

এক-ইভাবে একটি কাহিনী রচিত হয়েছে জরৎকারু বা সর্প রাজকন্যা সম্বন্ধে। ইনি ভালোবেসেছিলেন একজন জ্ঞানী মানুষকে এবং তাঁদের যে সন্তান হয়, সেটি অর্ধ-সর্প অর্ধ-নর আস্তিক। আস্তিক পিতার পরিবারের সঙ্গে অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে দেখা করে সর্পের প্রতি অকারণ বিদ্বেষ দূর করতে অনুরোধ জানান।

এ ছাড়াও আছে সেই কচ্ছপের কাহিনী যে অত্যন্ত ধীরগামী, কিন্তু নিঃশব্দে, বিনা আলস্যে নিজের কাজ করে। কথিত আছে, কচ্ছপই এই পৃথিবীকে ধারণ করে রেখেছে। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলেও এই জীবটি অমর। যখন দেবতা ও অসুরদের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ হয়, তখন ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদি বিপর্যয়ের মধ্যে কূর্ম বা কচ্ছপই পৃথিবীকে

পিঠের ওপর শক্ত করে ধরে রাখে। এটিই বিষ্ণুর কূর্ম অবতার, সৃষ্টির আদি রক্ষক।

আমরা চ্যবনমুনির কাহিনীও জানি। বারো বছর ধরে জলের নীচে প্রায়শ্চিত্তের সময়ে এই ঋষির সঙ্গে জলচর প্রাণীর সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়। একদিন জেলেদের মাছ ধরতে দেখে তিনি এত ক্রুদ্ধ ও মর্মাহত হন যে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে যখন রাজা তাঁর রাজ্য মুনিকে অর্পণ করবার সিদ্ধান্ত নিলেন, চ্যবন তা প্রত্যাখ্যান করেন।

আমাদের সঙ্গী এই শত-সহস্র রকম জলচর প্রাণী ও উদ্ভিদ সত্যিই এক বিস্ময়কর অজানা জগতের সন্ধান দিয়েছে মানুষকে।

সাগর শজারু

তারা মাছ

Printed at Jupiter Offset Works, Delhi-110032